আবদুল হক

ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব

৪৯০
[illegible]

A - 3010

ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব

৯০০
আবত

আবদুল হক

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪

মুক্তধারা ৮০৮

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আবুল বারক আলভী

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ।

[গ্রন্থস্বত্ব লেখকের]

মূল্য : সাদা : তের টাকা
নিউজপ্রিন্ট : নয় টাকা

জাতীয় গ্রন্থাকেন্দ্র, বাংলাদেশ
সংযোজন সংখ্যা
তারিখ
ডাক সংখ্যা
ক্যাটালগার
গ্রন্থাগারিক
৩০১০
৭০০
১০।৫।৮৫
জাতীয় গ্রন্থাকেন্দ্র, বাংলাদেশ
ঢাকা
৩০৪০
সংখ্যা
ক্যাটালগার
গ্রন্থাগারিক

BHASHA ANDOLANER ADIPARBA
[Essays on Language Movement]
By Abdul Huq
Second Edition : April 1984
Cover Design : Abul Bark Alvi
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka-1
Bangladesh.
Price : Whiteprint : Taka 13·00
Newsprint : Taka 9·00

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

ভূমিকা

সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের আরম্ভ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। সেই প্রথম ছাত্র-সম্প্রদায় অন্যতম (বলা উচিত অন্যতর) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু এই আরম্ভেরও আরেকটি আরম্ভ ছিল, সেটি করে-ছিলেন লেখক-সম্প্রদায়। তাঁরাই রাষ্ট্রভাষার তত্ত্বগত দিকটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছিলেন। কেউ একক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে, কেউ অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এ আলোচনা আরম্ভ ১৯৪৭ সালের জুন মাসে, কেননা তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে শাসকদল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা। মুসলিম লীগের তখন অপ্রতিহত প্রভাব। শুধু তাই নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের (সীমারেখা তখনও নির্ধারিত হয় নি) শিক্ষিত-সম্প্রদায়---রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং অছাত্র---সমগ্রভাবে না হলেও অধিকাংশই একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার সমর্থক ছিলেন, অথবা উর্দু ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রভাষার কথা চিন্তা করেন নি। সেই সময়ে এদেশের লেখক-সম্প্রদায় রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে বাংলার দাবিও উত্থাপন করেছিলেন। এ নিয়ে অনেক দিন যাবৎ তাঁরা লিখেছিলেন, তারই ফলে ভাষা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছিল।

সেই সময়ে, সাতচল্লিশের জুন ও জুলাই মাসে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিভিন্ন দৈনিক-সাপ্তাহিকে আমি চারটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলাম। উনপঞ্চাশের ফেব্রুয়ারিতে আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নে আরেকটি। এসব প্রবন্ধ কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা ভাবি নি, কেননা সাহিত্য হিসাবে এগুলি লেখা হয় নি। কিন্তু কয়েকটি কারণে প্রবন্ধগুলি এতদিন পরে গ্রন্থবদ্ধ করা হলো। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে ভাষা-আন্দোলনের কথাও এসে যাচ্ছে, কেননা ভাষা-আন্দোলনই ছিল এদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন, এবং এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল অবচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদী অনুভব। একই সঙ্গে এ ছিল এদেশের প্রথম সংস্কৃতি-আন্দোলন। এসব আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল, যা ক্রমে ক্রমে পরে উন্মোচিত হয়।

ভাষা-আন্দোলনের কথা লিখতে গিয়ে সেই সময়ে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নে কে কি লিখেছিলেন, ইতিহাস-লেখকগণ তার কিছু কিছু উল্লেখ করছেন, কিন্তু এসব উল্লেখ অসম্পূর্ণ। তখন কে কি লিখেছিলেন তার একটা আলোচনা গ্রন্থ-শেষে 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি' প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। এটি 'বাংলা একাডেমী গবেষণা-পত্রিকা'য় ১৩৭৯ সনের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থারম্ভের 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব' লেখাটি সেই পর্বের স্মৃতিচারণ। এটি "বই" পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৮১ সংখ্যায় পত্রস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলে এসব প্রবন্ধে কিছু দ্বিরুক্তি থেকে গেল। এইসব প্রবন্ধ থেকে ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা-আন্দোলনের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতির একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

আমার সাহিত্য-জীবনে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছি, সেই প্রথম পর্যায়ে ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখিত। সে আজ প্রায় উনত্রিশ বছর আগের কথা। এখন পড়তে গিয়ে মনে হয়, বিতর্কের উত্তাপে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে কিছু অসতর্ক উক্তি করা হয়েছে। পাকিস্তানের এক-মাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার কথা বলা হয়েছে, আবার কিছুদিন পরে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথাও বলা হয়েছে। একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভাষা হয় না, যা হয় তা কেন্দ্রীয়ভাবেই হয়। এ ভুল আরও কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা আর কতটুকু। ইংরেজী তখন সরকারী ভাষা ছিল, রাষ্ট্রভাষা নয়। এইসব এবং আরও কোন কোন প্রসঙ্গ হয়তো আজ কিছু কিছু মেজে-ঘষে দেওয়া যেতো, কিন্তু তা করা সঙ্গত মনে হয় নি। সেদিন যা লিখেছিলাম তা-ই ইতিহাসের দরবারে উপস্থাপন করা হলো। তবে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন 'আরবী হরফে বাংলা' প্রবন্ধটির ক্রিয়াপদ মূলে ছিল সাধুরীতির।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। এজন্য পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন এবং ভুলগুলি সংশোধন করে নেবেন বলে আশা করি।

'মুক্তধারা' কর্তৃপক্ষের উৎসাহে এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। তাঁরা আগ্রহী না হলে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হতো না, এ জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

আবদুল হক

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

সূচীপত্র

ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব	৯
বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব	১৫
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	২০
উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে	২৭
পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	৩২
আরবী হরফে বাংলা	৩৪
ভাষা আন্দোলনের পটভূমি	৪০

মহানগর পাঠাগার

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রবন্ধ :

ক্রান্তিকাল
সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ
বাঙালী জাতীয়তাবাদ
সাহিত্য ও স্বাধীনতা

ছোটগল্প :

রোকেয়ার নিজের বাড়ী
ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী

নাটক :

অদ্বিতীয়া
ফেরদৌসী
সোনার ডিম

অনুবাদ-নাটক :

পুতুলের সংসার
প্রেতাত্মা
রসমার্সহোম
হেড্ডা গাবলার
মহাস্থপতি
জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান
ইলিনয়ে এবলিঙ্কন

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব

সাতচল্লিশের ৩রা জুন তারিখে ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং একে সমর্থন ক'রে বেতার-ভাষণ দেন পণ্ডিত নেহরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং সরদার বলদেব সিং।

তেসরা জুনের মাউণ্টব্যাটেন প্লানকে আমরা মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছিলাম। আমরা অর্থাৎ সেই সময়ের তরুণ বাঙালী মুসলিম সমাজ। পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতেন না এমন ব্যক্তি মুসলিম-সমাজে তখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের কেমন যেন একটা অবাস্তব আশা ছিল যে ভারত-বিভাগ যদি হয় তাহলে অখণ্ড বঙ্গদেশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা ভাষা সাহিত্য ইতিহাস ভুগোল সব দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা বঙ্গদেশকে একটা অখণ্ড সত্তা হিসাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলাম। এই ঐতিহাসিক সত্তাকে ভাগ করা সত্যই সম্ভব এটা যেন ভাবতে পারতাম না। কিন্তু ভারত-বিভাগের অংশ হিসাবে বঙ্গদেশ বিভাগেরও ব্যবস্থা হলো। আমরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন দিয়াছিলাম কিন্তু বঙ্গ-বিভাগ চাইনি। তার কারণ বঙ্গদেশের ঐ ঐতিহাসিক সত্তা। শুধু আমরা চাইনি তা নয়, আরও অনেকে চাননি। অনেকেরই মনে থাকতে পারে, সাতচল্লিশের গোড়ার দিকে যখন বোঝা গেল ভারত-বিভাগ অনিবার্য তখন অবিভক্ত বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র করার একটা চেষ্টা হয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের একাংশের পক্ষ থেকেই। দু'দলেরই শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন প্রাদেশিক নেতা সে চেষ্টা করেছিলেন, ঐ রাষ্ট্রের একটা খসড়া পরিকল্পনাও তৈরী করেছিলেন কিন্তু যথেষ্ট সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত তা ফলবতী হয়নি। তথাপি বঙ্গদেশের সেই ঐতিহাসিক সত্তা তখনও মিথ্যা হয়ে যায়নি। রাজনীতি

অপেক্ষা সাহিত্যের প্রতিই আমার মনোযোগ ছিল বেশী, হয়তো এই কারণে বঙ্গদেশের সেই ঐতিহাসিক সত্তা বিকাশে কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকাকেই বড় করে দেখতাম। অতএব বঙ্গদেশ বিভাগে কেমন একটা বেদনা অনুভব করেছিলাম, যা হয়তো রাজনীতিকরা অনুভব করেননি। সেই প্রথম অভিজ্ঞতা হলো ভাষা সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল যা-ই হোক, কবি-সাহিত্যিককে আমরা যতোই সম্মান দেই, দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন আসলে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, যেমন আবহমান কাল ধরে করেছেন উচ্চাভিলাষী দিগ্বিজয়ীগণ, ইতিহাস ও ভূগোলকে বারংবার নূতনভাবে বিন্যাস করে।

আমি তখন কোলকাতায় 'সওগাত' এবং 'শিশু-সওগাত'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। সাপ্তাহিক 'বেগম'-ও আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ঐ সাপ্তাহিকও আমার কর্তব্যের অন্তর্গত। এগারো নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রীটে অফিস। এই সূত্রে অনেক কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণার পর হিসাব করে দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালীরাই সংখ্যাগুরু হতে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটি বাঙালী মুসলিম-মানসে এক ধরনের আস্থা সৃষ্টি করেছিল। ভাবী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে অনেক রোমান্টিক জল্পনা। সে জল্পনার মধ্যে বাঙালী মুসলমানের অনেক রঙিন স্বপ্নও মেশানো ছিল। সেই সময়ে কবি আবুল হোসেন একদিন বললেন, পশ্চিমারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাচ্ছে, এই প্রয়াসের প্রতিরোধ দরকার। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। সংবাদপত্রেও এই প্রয়াসের সংবাদ প্রকাশিত হলো। বাঙালীদের দিক থেকে দেখতে গেলে, পাকিস্তানের রঙিন জল্পনার উপর এই ছিল প্রথম আঘাত। কবি ফররুখ আহমদকে একথা বললাম; কথা হলো আমরা বাংলা রাষ্ট্র-ভাষার সপক্ষে লিখব এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও প্রচারণা চালাব। ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার তখন খুব ঘনিষ্ঠতা। দৈনিক 'আজাদ' ছেড়ে প্রধানত তাঁরই আগ্রহে আমি সাতচল্লিশের ৩রা জানুয়ারী তারিখে 'সওগাত'-এর সহযোগী সম্পাদকের পদে যোগদান করি। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

'সওগাত'-এ যাঁরা আসতেন সুযোগ-মতো তাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতাম। সাংবাদিকতা অথবা সাহিত্যচর্চা যাঁরা

করতেন তাঁদের কেউ উর্দু রাষ্ট্রভাষা সমর্থন করতেন এরকম দেখিনি — অবশ্য আমার জানা-মতে (কবি গোলাম মোস্তফা এবং সাংবাদিক-লেখক মুজিবুর রহমান খাঁ উর্দুর সমর্থক ছিলেন)। আমার পরিচিত মহল খুব বড়ো ছিল তাও নয়। এখন ঠিক মনে পড়েছে না ফররুখ আহমদ এবং আমি কার-কার কাছে যুক্তভাবে গিয়েছিলাম। তবে আবদুল গনি হাজারী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম মনে পড়ে। 'সওগাত' অফিসের উল্টা দিকে সাপ্তাহিক 'কাফেলা'-র অফিসে। হাজারী সাহেব সেই সময়ের আরো দু'একজনের মতো প্রথমটায় ক্ষণিকের জন্য উর্দুর সপক্ষে বলেছিলেন, তারপর বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি তিনি বরাবর সমর্থন করেছেন।

বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে লেখা সেই সময়ে আমি একটা অবশ্য-করণীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। পর-পর চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, বছর দেড়েক পরে আরো একটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধের নাম "বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দু'কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন এবং ২৯শে জুন তারিখে দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর রবিবাসরীয় বিভাগে। আহসান হাবীব ছিলেন ঐ বিভাগের সম্পাদক। বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে বাঙালী সমাজে ইংরেজী, উর্দু ও হিন্দীর প্রতি পক্ষপাত এবং বাংলা ভাষার ব্যাপারে হীনমন্যতার সমালোচনা করা হয়েছিল এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের সপক্ষে কিছু কথা বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" ৩০শে জুন তারিখে দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে পাকিস্তানে দু'টি রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়নি, একটি রাষ্ট্রভাষার কথা বলা হয়েছিল, সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উর্দুর চাইতে অধিকতর উন্নত এবং ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালীরা উর্দু-ভাষীদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এই ছিল প্রধান যুক্তি। আরও বলা হয়েছিল উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হলে ইংরেজীর স্থান নেবে উর্দু, ইংরেজী জানা না জানা দিয়ে যেমন চাকরির যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়

তেমনি উর্দুর বেলায়ও করা হবে, তার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। পাকিস্তানে উর্দু-ভাষীদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি হবে বেশী, সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীরা হবে দ্বিতীয়স্থানীয়। আরেকটি কথা বলা হয়েছিল যে-স্বাধীনতা আসছে ভাষাগত স্বাধীনতা না পেলে তা হবে আংশিক এবং বদ্ধমুখ স্বাধীনতা।

কোথাও কোথাও এরকম একটা ইঙ্গিত দেখেছি যে দৈনিক 'আজাদ' কর্তৃপক্ষের অভিমত সেই সময় বাংলার সপক্ষে তেমন ছিল না এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সতর্কতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। কথাটা খুব সম্ভব ঠিক, তবে ঐসব উক্তিসহ তিন কলামব্যাপী আমার প্রবন্ধটি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছিল।

এর প্রায় এক মাস পরে ২৭শে জুলাই তারিখে 'ইত্তেহাদ'-এ প্রকাশিত 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধের কয়েকটি বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। বাংলা ভাষায় পৌত্তলিকতার প্রভাবের যে কথা কোনো কোনো মহলে বলা হতো তার উল্লেখ করে বলা হয়েছিল বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর চেয়ে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। পৌত্তলিকতা কোনো ভাষার স্থায়ী লক্ষণ বা একমাত্র লক্ষণ নয়, কোন্ ধর্মাবলম্বী লেখক কোন্ ভাষায় কি পরিমাণে লিখেছেন তার উপরেই নির্ভর করে সে ভাষার উপর কোন্ বিশেষ ধর্মের প্রভাব কতখানি। অন্যথায় কোনো ভাষাই কোনো ভাষা থেকে পবিত্রতর বা অপবিত্রতর নয়।

আমি তখন মোহাম্মদ আবদুল হক নামে প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা লিখতাম (অবশ্য ততদিনে কবিতা লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম) এবং সেই নামেই এসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে লেখার অদম্য প্রেরণায় মিসেস এম. এ. হক ছদ্মনামে চতুর্থ প্রবন্ধ লিখেছিলাম সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার ৩রা আগষ্ট সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। দেখাদেখি কয়েকজন লেখিকা বাংলা ভাষার সপক্ষে 'বেগম'-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে লিখেছিলেন মনে পড়ে।

সেই সময়ে তরুণ লেখকদের মধ্যে মাহবুব জামাল জাহেদী বিশেষ প্রতিশ্রুতিবান ছিলেন। তিনি 'সওগাত' অফিসে আসতেন এবং বিভিন্ন ধরনের তাঁর কয়েকটি লেখা 'সওগাত'-এ ছেপেছি বলে মনে পড়ে। ২০শে জুলাই তারিখের দৈনিক ইত্তেহাদ-এ ''রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'' নামে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বাংলা ও উর্দু উভয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ফররুখ আহমদ আশ্বিন ১৩৫৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৭) সংখ্যা 'সওগাত'-এ ''পাকিস্তান ঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ১৯৪৭ সালের মধ্যেই এ বিষয়ে আরও যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাসেম এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। মনে হয় আরও কেউ কেউ লিখে ছিলেন যাঁদের কথা এখনও কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি বহু প্রখ্যাত স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক তাঁদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। মূলত তারই ফলস্বরূপ পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত-সমাজে এবং ছাত্র-সমাজের বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে একটা প্রবল জনমত গঠিত হয়েছিল। বলা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে ঐ সমাজে প্রথমটায় কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এমন কি অনেকের, বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে, উর্দুর প্রতিই সমর্থন ছিল বেশী।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে লিখিত কয়েকটি প্রগতি-মূলক প্রবন্ধের একটা পর্যালোচনা ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে (অথবা কাছাকাছি সময়ে) ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ঐ সাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যাঁরা বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে লিখেছিলেন তাঁদের রচনা থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়ে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'-র মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ''ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি'' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই আদিপর্বের আলোচনা করা হয়েছে। এর পর প্রকাশিত ডঃ মযহারুল ইসলামের ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'' গ্রন্থের গোড়ার দিকে ভাষা-আন্দোলনের ঐ পর্বের

[stamp] ঢাকা

বিবরণ দিতে গিয়ে একই রচনাসমূহ থেকে ঠিক একই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, বস্তুত মনে হয় বিবরণটি ঐ প্রবন্ধেরই সারাংশ, কিন্তু ঋণ স্বীকার করা হয়নি। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন, ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। তিনি লিখেছিলেন জুলাই-এর শেষ দিকে, কিন্তু জুন মাসেই দৈনিক 'আজাদ' এবং 'ইত্তেহাদ'-এ এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায় দেড় বছর পরে আরও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম সরাসরি ঠিক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নয়, আরবী হরফে বাংলা লেখা প্রচলনের সরকারী প্রয়াসের প্রতিবাদে। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা-আন্দোলনের তীব্রতার মুখে পাকিস্তান সরকার পিছিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাঁকা পথে উর্দুর তরক্কীর উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার সপক্ষে সক্রিয় অভিযান এবং অন্যান্য তৎপরতা আরম্ভ করেছিলেন। তারই প্রতিবাদে লিখেছিলাম "আরবী হরফে বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর রবিবাসরীয় সাহিত্যবিভাগে, ২০শে মার্চ তারিখে। আমি নিজে তখন দৈনিক 'আজাদ'-এর সিনিয়র সাব-এডিটর, কিন্তু প্রবন্ধটি ঐ দৈনিককে দিতে ভরসা পাইনি। প্রবন্ধটি প্রকাশের তারিখের সঙ্গে আরবী হরফে বাংলা লেখা-বিরোধী আন্দোলনের সময় মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, প্রবন্ধটি ঐ আন্দোলনে হয়তো কিছু সহায়তা করেছিল।

এইসবই ছিল সাময়িক প্রবন্ধ, এই কারণে আমার কোনো প্রবন্ধ-গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এসব প্রবন্ধের কোনো মূল্য থেকে থাকলে তা শুধু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে, সাহিত্য হিসাবে নয়।

১৯৭৫

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি শুধু ইংরেজীরই আধিপত্য দেখতাম, অন্য কোন ভাষার আধিপত্য না দেখতাম, তাহলে বলতাম এর কারণ ইংরেজীর ওই রাষ্ট্রভাষিক মর্যাদা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার অতি-মূল্যবানতা, এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাংলার নিম্নতর স্থান-নির্দেশ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাঙালীদের ব্যবহারিক জীবনে শুধু ইংরেজীর নয়, উর্দু এবং হিন্দীরও সমান আধিপত্য।

যে-ক্ষেত্রে উর্দু বা হিন্দিভাষীর সঙ্গে একজন বাঙালীর কথা বলার দরকার হয়, সে-ক্ষেত্রে বাঙালী কোন্ ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকেন? যদি উভয় পক্ষেরই ইংরেজী জানা থাকে তবে কথা হয় ইংরেজীতে। যদি দু'জনের মধ্যে একজন ইংরেজী-অজ্ঞ হন, তবে কথা হয় সাধারণত সেই অবাঙালীর মাতৃভাষায়, সে কোটিপতি ব্যবসায়ী হোক অথবা স্টেশনের কুলি হোক, যদি বাঙালী পক্ষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী এম, এ, হন তবুও। সহজ কথায় মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, ইংরেজীতে কথা বলব না—দেশব্যাপী এই প্রতিজ্ঞা যদি আজ করা হয়, তবে জওহরলাল থেকে শুরু করে বোধ হয় তাঁর আর্দালী পর্যন্ত সকলেরই সঙ্গে ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জী এবং হুমায়ুন কবীর কথা বলবেন খুব সম্ভব হিন্দিতে, বাংলায় নয়। জওহরলাল বাংলা বলবেন না, তিনি জানেন না। কিন্তু সুনীতি চ্যাটার্জী এবং হুমায়ুন কবীর উভয়েই হিন্দি জানেন অন্ততঃ কথা বলবার মতো, যেমন প্রায় বাঙালীই জানেন।

---

* ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কোলকাতার অধুনা-লুপ্ত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার ২২শে এবং ২৯শে তারিখে রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় দু'কিস্তিতে এই নামীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ। ২২শে জুন তারিখে প্রকাশিত প্রথম অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বস্তুতঃ এটাই হল সাধারণ সত্য। প্রায় বাঙালী এটা মনে-প্রাণে জানেন যে, হিন্দি-উর্দু ভাষীর সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁকে হিন্দি-উর্দুতে বলতে হবে, কেননা অপর পক্ষ বাংলা জানেন না। জ্ঞাতসারেই বাঙালী এই অবশ্য-কর্তব্য নিজের ঘাড়ে নেয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এটা একটা বাধ্যবাধকতা; এরূপ বাংলা জানা এবং বলার বাধ্যবাধকতা ও গরজ এখন পর্যন্ত অবাঙালীর নেই।

আমি এই কোলকাতার কোনো এক অভিজাত মুসলিম পরিবারের কথা জানি, যে-পরিবারের কর্তা আমাদের জেলার লোক, খাঁটি বাঙালী। তাঁর স্ত্রী (২য় পক্ষ) উর্দুভাষিণী। স্ত্রীর অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলে বরাবর উর্দুভাষী চাকর রাখা হয়েছে। বর্তমানে কর্তা বৃদ্ধ এবং কর্ত্রী প্রায় প্রৌঢ়া। তাঁদের ছেলে-মেয়ে সবশুদ্ধ ৮টি। আজ সেই খাঁটি বাঙালী-প্রতিপালিত সংসারটি সম্পূর্ণরূপে অবাঙালী উর্দুভাষী পরিবারে পরিণত হয়েছে। স্বয়ং কর্তাকেও স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে হয়। আমার প্রশ্ন: সেই উর্দুভাষিণী গৃহিণীর প্রতি বিবেচনাই কেন সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেল? এই কোলকাতার কোনো একটি মেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় দেখেছি, সেখানকার উর্দুভাষী চাকরটির সঙ্গে সকলেই কথা বলে উর্দুতে। চাকরটি এই সেদিন পর্যন্ত ছিল রিক্সাওয়ালা, দাঙ্গা-পরিস্থিতিতে রিকশা টানা নিরাপদ নয় বলে বাবুর্চির কাজে লেগেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, সে আজ ৮ বছর ধরে বাংলায় বাস করছে। এই ৮ বছরে নিশ্চয়ই অধিকাংশ বাঙালীকে সে রিকসায় টেনেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলা বলতে শেখেনি, বুঝতেও শেখেনি; কেননা সে প্রয়োজন আজ পর্যন্ত সে অনুভব করেনি, তাকে এবং তার মতো লক্ষ লক্ষ অবাঙালীকে বাংলা শেখানোর প্রয়োজনীয়তা ৬ কোটি বাঙালী কোনদিন প্রয়োজন মনে করেনি। ইংরেজের সঙ্গে, এমনকি একজন তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে কথা বলতে হলেও ইংরেজীতে কথা বলতে হবে, এমনি একটা সহজাত ধারণা যেমন বাঙালীদের আছে, তেমনি একটা উর্দু-হিন্দিভাষী কুলি-চাকর রিকসাওয়ালা মেথরের সঙ্গে কথা বলতে হলেও উর্দু-হিন্দিতে কথা বলতে হবে, এরূপ একটা সহজাত ধারণা শুধু হেঁজিপেঁজি বাঙালীর নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান

অধিকারী বাঙালীরও আছে। এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবু সাধারণভাবে একথা সত্য। অথচ উর্দু-হিন্দি ইংরেজীর মতো রাষ্ট্রভাষা নয়। উর্দু-হিন্দিভাষীরা শাসক-সম্প্রদায় এবং বাঙালীরা শাসিত সম্প্রদায় নন।

এর প্রধান কারণ এই যে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়নি। তাঁর জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অত্যন্ত কাঁচা, তাঁর পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালীরা সাধারণত বুঝতে পারেন না যে,নিজ বাসভূমেও ইংরেজ তথা অবাঙালীদের সঙ্গে তাঁদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয়তাবোধের দিক দিয়ে নিজেকে ছোট করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজীতে এবং নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলার অর্থ কেবলমাত্র এইটুকুই নয় যে, ইংরেজী আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজীর মর্যাদা বেশী। এর কারণ আমাদের অর্ধস্ফুরিত জাতীয়তাবোধ, অর্ধস্ফুরিত জাতীয়-মর্যাদাবোধ। তা নইলে নিজেদের মধ্যেও কোনো বাঙালী ইংরেজী বলতেন না এবং বলতে পেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন না—বাংলা ভাল বলতে পারিনে, বাংলায় কিছু লিখতে পারিনে, বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারিনে বলে লজ্জার পরিবর্তে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন না। জাতীয় মর্যাদাবোধ অতি ক্ষীণ বলেই এবং সেই মর্যাদাবোধের অঙ্গস্বরূপ বাংলা ভাষার মর্যাদাবোধ অতি ক্ষীণ বলেই, উর্দু-হিন্দিভাষীর সঙ্গে বাঙালীরা বাংলার পরিবর্তে উর্দু-হিন্দি বলার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে থাকেন।

অথচ কেমন উর্দু-হিন্দি আর কেমন ইংরেজী যে অধিকাংশ বাঙালী বলেন, তা ভেবে ওয়াকেফহাল মাত্রেই কৌতুক অনুভব না করে পারেন না। আমরা কয়জন ব্যাকরণ-শুদ্ধ উর্দু-হিন্দি জানি? অথচ সাধারণ অর্থে শতকরা যতজন বাঙালী শিক্ষিত তার চেয়ে অনেক বেশী বাঙালীকে জীবনের কোনো না কোনো দিন উর্দু-হিন্দি বলতে হয়-ই। সে উর্দু-হিন্দি কার কাছে শেখা? সেইসব উর্দু-হিন্দিভাষীদের কাছে শেখা, যাদের অধিকাংশই আমাদের মতো অশিক্ষিত এবং আমাদের অশিক্ষিতদের মতো তাদেরও অশিক্ষিতদের ভাষা অমার্জিত। শুধু তাই নয়, আমাদের

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা যেমন বিভিন্ন রকম, উর্দু-হিন্দিও তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। সেই বিভিন্ন অঞ্চলের উর্দু সেই-সব অঞ্চলের প্রধানত অশিক্ষিত লোকদের কাছে শিখে আমরা যে কি অপরূপ খিঁচুড়ি উর্দু-হিন্দি বলে থাকি, তা' আমরা নিজেরা না বুঝতে পারি, মার্জিত উর্দু-হিন্দিভাষীরা নিশ্চয়ই বোঝেন। আমাদের সেই উর্দু-হিন্দিভাষা তেমনই হয়, বেকায়দায় পড়ে উর্দু-হিন্দিভাষীরা যেমন বাংলা বলতে শিখেছে এবং যেমন বাংলা শুনে, প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে প্রত্যেক বাঙালীই কৌতুক অনুভব করেন।

উর্দু-হিন্দির মতো, ইংরেজী বলার বেলায়ও তেমনি ঘটে। আমরা যে ইংরেজীতে কথা বলি, তা' কেতাবী ইংরেজী, আর এই ইংরেজী শিখেছি ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর শেক্সপীয়ার থেকে আরম্ভ করে দেশী বি. এ. এম. এ. পাস মাস্টার ও অধ্যাপক পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যিক এবং ইংরেজী-অভিজ্ঞ-দের কাছে। আধুনিক মার্জিত কথ্য-ইংরেজীর তুলনায় কী অপরূপ খিঁচুড়ি ইংরেজী যে আমরা বলি, তা' আমরা না জানলেও মার্জিত-ভাষী ইংরেজ এবং মার্জিত ইংরেজ-অভিজ্ঞ এদেশীরাই জানেন। মার্জিত খাঁটি আধুনিক ইংরেজী যে এদেশের কেউ-ই জানেন না এবং বলতে পারেন না তা নয়; আমি তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলছি। কিন্তু তাঁরা ছাড়া আর সবাই, এমনকি ইংরেজীর বহু এম. এ-ও যে খাঁটি আধুনিক মার্জিত ইংরেজী পুরোপুরিভাবে জানার এবং বলার দাবি করতে পারেন না, বিশেষত উচ্চারণের দিক দিয়ে, তা অত্যন্ত বিদিত সত্য। তবু তাঁদের থেকে শুরু করে আণ্ডার-ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিতরা গভর্নর বারোজ থেকে শুরু করে একজন শুঁড়ি ইংরেজ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ইংরেজী বলবেনই, ইংরেজী ছাড়া বাংলায় তাঁরা চিঠি পর্যন্ত লিখবেন না, এবং ইংরেজী জানার আত্মপ্রসাদে বাংলা ভালো জানি না বলে আভিজাত্য প্রকাশ করবেনই।

এরূপ ইংরেজী-প্রীতি, এরূপঃ উর্দু-হিন্দি-প্রীতির কোনো মূল্য, কোনো মর্যাদা নেই খাঁটি বাংলা-প্রেমীদের কাছে। এভাবে ইংরেজী-ভাষী উর্দু-হিন্দি-ভাষীদের কাছে নিজেদের মাতৃভাষার অমর্যাদা যাঁরা করেন, তাঁরা আত্ম-অমর্যাদা করেন, তাঁদের খাঁটি দেশপ্রেমী বলতে অন্ততঃ আমার

মন চায় না। আমি তাঁদের মধ্যে দেখতে পাই ইংরেজীয়ানাপ্রীতি, অবাঙালীয়ানাপ্রীতি।

আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ে উত্থত হয়ে থাকে: আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজী-উর্দু-হিন্দি বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু-হিন্দিভাষীরা কেন বাংলা শিখতে বাধ্য হবে না? আমার মত এই যে, এদেশে যেসব অভারতীয় অথবা অবাঙালী বাস করবে, তাদের বাংলা শিখতে হবে, যদি তারা এদেশে বাস করতে চায় এবং আমাদের সঙ্গে চলতে চায়। বাংলা শেখা তাদেরই গরজ। তাদের জন্য ইংরেজী উর্দু-হিন্দি শেখা আমাদের গরজ নয়, বরং আমাদের পক্ষে ঘোর অমর্যাদাকর। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংযোগের জন্য যতটুকু ইংরেজী উর্দু-হিন্দি শেখা দরকার, শুধু ততটুকুই আমরা শিখব এবং অন্তত ততটুকু বাংলা পৃথিবীর জাতিপুঞ্জকেও শিখতে হবে। ভারতের অন্য অঞ্চলে যেয়ে যেমন সে-অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরে যেয়ে যেমন সেখানকার ভাষা ব্যবহার না করে আমাদের গত্যন্তর নেই, তেমনি ভারতের অন্য অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরেকার দেশের লোকদের বাংলায় এসে, বাংলা ভাষা ব্যবহার না করে গত্যন্তর না থাকা উচিত। তাতেই প্রকৃত জাতীয় মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

দৈনিক ইত্তেহাদ
২৯ জুন, ১৯৪৭

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে, কোন্ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে সব থেকে বেশী সুবিধা হবে, কোন্ ভাষায় পাকিস্তানের সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোন্‌টি, কোন্ ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং কোন্ ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী। যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই, তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।

পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ভাষা পাঁচটি : বেলুচী, পশ্‌তু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী এবং বাংলা। পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু ভাষা নেই তা নয়, বাংলায়ও আছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের তো নয়ই, পশ্চিম-পাকিস্তানেরও কোনো প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দু নয়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচন করতে হলে এই পাঁচটি ভাষার মধ্য থেকেই করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম চারটি ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের কারোই সংখ্যা বাংলাভাষীদের সমান নয়। পশতুভাষীদের সংখ্যা ১ কোটির অনেক নীচে। বেলুচী এবং সিন্ধীভাষীদের সংখ্যা তার চেয়েও কম। সবচেয়ে বেশীসংখ্যক লোক কথা বলে পাঞ্জাবীতে। কিন্তু ভাষা হিসাবে এগুলোর কোনটিই প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। এসব ভাষায়

কোনো উন্নত সাহিত্য গড়ে উঠেনি। অতএব এসব ভাষাকে রাষ্ট্রভাষিক প্রশ্ন থেকে বাদ দেওয়া যায়।

বাকী থাকে বাংলা। আমাদের যে 'বিকলাঙ্গ' পূর্ব-পাকিস্তান, সে পাকিস্তানেও বাংলাভাষীর সংখ্যা পাঁচ কোটির মতো। সিলেটের গণভোটে আমাদের জয় হলে এবং সীমা-নির্ধারণ কমিশনের রায়ের ফলে আপাত-নির্দিষ্ট পূর্ব-পাকিস্তানের সংলগ্ন মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলো এর সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ কোটির কিছু বেশী। এই পাঁচ কোটির প্রায় সকলেই বাংলাভাষী। পশ্চিম-পাকিস্তানের জনসংখ্যা কিছু কমবেশী তিন কোটি, এবং ভাষা হিসেবে এই তিন কোটি লোকও আবার প্রধান চার ভাগে বিভক্ত।[১]

পাকিস্তানের সব থেকে বেশী লোকে কথা বলে বাংলা ভাষায়। এই হিসেবে পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি সবচেয়ে বেশী বাংলার। শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষাগুলোরই নয়, সমগ্র ভারতের যে-কোন ভাষার সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্য শ্রেষ্ঠতর। বাংলা সাহিত্যের মতো ভারতের আর কোনো সাহিত্যই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি; পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যগুলোর পর্যায়ে ভারতের একমাত্র বাংলা সাহিত্যই স্থান পেতে পারে। যে-কোন সাহিত্যের বিকাশ কেবল প্রতিভা, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদির ওপরই নির্ভর করে না, খানিকটা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির ওপরই নির্ভর করে। ভারতের বা পাকিস্তানের যে-কোনো সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে প্রমাণিত হয় ভারতের তথা পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে বাংলা।

---

১ জনসংখ্যার এসব উল্লেখ তখনকার আন্দাজী হিসাবের ভিত্তিতে। স্পষ্টতই পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশী ধরা হয়েছিল। তবে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বোধ হয় এটা অস্বাভাবিক ছিল না। তখন চূড়ান্তভাবে সীমারেখা নির্ধারিত না হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানের আয়তন এখানকার তুলনায় বৃহত্তর হবে বলে মনে করা হতো। উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা পূর্ব-পাকিস্তানের (এবং খুলনা জেলা পশ্চিমবঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। (পাদটীকা ১৯৭৫)

অতএব পাকিস্তানের—কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের নয়, পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্তানকে নিয়ে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের দিক দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার ঃ এমনকি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্য একমাত্র বাংলা ভাষাই।

তবুও আমাদের দেশে এখনও অনেকে আছেন, যাঁরা হয়তো বাংলা ভাষার এই দাবি স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতে পারেন।

বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার সপক্ষে উর্দুর দাবি অত্যন্ত কম। পশ্চিম-পাকিস্তান বা পূর্ব-পাকিস্তান, কোনো অংশেরই প্রধান ভাষা উর্দু নয়, এবং যদিও সমগ্র ভারতে উর্দুভাষীদের সংখ্যা অনেক তবু পশ্চিম বা পূর্ব কোনো পাকিস্তানেই তাঁদের সংখ্যা বাংলাভাষীদের চেয়ে বেশী নয়। এবং ভাষাগত উৎকর্ষ ও সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে উর্দুর চেয়ে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠতর। অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবি বাংলার চেয়ে অনেক কম।

তবু যদি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে তা অত্যন্ত অবিবেচনার মতো কাজ হবে। কেননা পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের আট কোটি লোকের জন্য এমন একটা ভাষা নেওয়া হবে যা তাদের মাতৃভাষা নয়। এর ফলাফল অত্যন্ত অশুভ হবে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নিলে তার ফলাফল আমাদের বাংলাভাষীদের পক্ষে কি রকম দাঁড়াবে, তা বিবেচনা করে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে—যিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে বাংলায় এম. এ. পাস করবেন তিনিও, যদি বাংলা সাহিত্য ও ভাষা নিয়ে গবেষণা করে তিনি পৃথিবীর অন্যতম পণ্ডিত বলেও গণ্য হন, বা সাহিত্য-সাধনার ফলে তিনি যদি নোবেল প্রাইজও পান, তবু আইনত তিনি সরকারী চাকরির উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন না, উর্দু যদি তিনি না জানেন। পক্ষান্তরে, কেবলমাত্র উর্দু জানার জন্য একজন ম্যাট্রিক

পাস উর্দুভাষীও তাঁর চেয়ে চাকরির অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। অবশ্য পদমর্যাদার দিক দিয়ে একথা বলছি না ; একজন ম্যাট্রিক পাস উর্দুভাষী অন্তত পিওনও হতে পারবে, কিন্তু উর্দু-অজ্ঞ বাংলায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম অধিকারী একজন এম. এ. চাকরির কোনোই অধিকার পাবে না—যেমন ইংরেজী না জানলে বর্তমানে কারো চাকরির অধিকার নেই। এইটাই হল স্বাভাবিক—এইটাই হল আইনত ন্যায়ের কথা। ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা বলে বর্তমানে আমাদের যেমন নিম্ন-প্রাইমারী থেকে এম. এ. পর্যন্ত ইংরেজী শিখতে হচ্ছে এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করার জন্য সাধনা করতে হচ্ছে, এবং কতখানি আয়ত্ত করতে পারি তার ওপর চাকরির মান, বেতন, উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করছে, উর্দু-রাষ্ট্রভাষা হলে তখনও তেমনি আমাদের নিম্ন-প্রাইমারী থেকে এম. এ. পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে, আয়ত্ত করার জন্য সাধনা করতে হবে এবং কতখানি আয়ত্ত করতে পারি, তার ওপর আমাদের চাকরির মান, বেতন, উন্নতি, এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করবে। পক্ষান্তরে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উর্দু-শিক্ষিতই চাকরির যোগ্যতা লাভ করবেন, এবং প্রত্যেকটি বাংলা-ভাষীই চাকরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বেন।

রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দরুন উর্দু সংবাদপত্রের মর্যাদাই হবে সবচেয়ে বেশী, যেমন বাংলা সংবাদপত্রের চেয়ে বর্তমানে ইংরেজী সংবাদপত্রের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। এবং এ ক্ষেত্রে প্রভাবের দিক দিয়ে উর্দুভাষীদের সঙ্গে আমরা কখনোই পারবো না ; যেমন ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকার সঙ্গে আমাদের পারা সম্ভব হয়নি। উর্দুভাষী-পরিচালিত সংবাদপত্রের মতো উৎকৃষ্ট এবং প্রভাবযুক্ত আমাদের পরিচালিত উর্দু সংবাদপত্র হবে না। আইন পরিষদে উর্দুভাষীদের মতো উর্দু আমরা বলতে পারবো না, অতএব সেখানে আমাদের প্রভাব হবে অত্যন্ত কম। মোটের উপর পাকিস্তানে উর্দুভাষীর সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের হবে সবদিক দিয়েই সুবিধা, কিন্তু সবদিক দিয়েই অসুবিধা হবে আমাদের। ঠিক এইরকম ব্যাপার পশ্চিম-প্যাকিস্তানের অন-উর্দুভাষীদের বেলায়ও হবে।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর কিরূপ অবিচার হবে তাই শুধু আমি দেখালাম। নইলে উর্দুর প্রতি আমার বা আমার বিশ্বাস অন্য কোন বাংলাভাষীরই বিতৃষ্ণা নেই, বরং শ্রদ্ধাই আছে। ভারতে বৃটিশ আমলে যাঁরা স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা উর্দুতে তাঁদের বক্তব্য বলে গেছেন; শিবলী নোমানী, সৈয়দ আহমদ, হালী, ইকবাল—এঁদের সাধনায় উর্দু-ভাষায় একটা বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে। অতএব উর্দু সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু তবু বর্ণিত কারণসমূহের জন্য উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, এবং তা করলে পাকিস্তানের প্রায় সব নাগরিকের ওপরই অবিচার করা হবে, শুধু সেই কথাই আমার বক্তব্য।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে আমাদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি শুধু ব্যাহত হবে না, রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হওয়া সত্ত্বেও যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে তবে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেও বা তেমনি হবে না কেন?

এর জবাব এই যে, আমরা সব সময় জানতাম—ইংরেজী বিদেশী ভাষা, সাম্রাজ্যবাদের ভাষা, আমাদের ভাষা নয়। অতএব, তার প্রভাবে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হতে পারেনি। বরং দ্রুততরই হয়েছে। কেননা ইংরেজীর মধ্য দিয়ে আমরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, আমাদের কূপমণ্ডূকতা ঘুচে গেছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধই হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে উর্দু সাহিত্য ইংরেজীর থেকে তো নয়ই, বাংলা সাহিত্য থেকেও শ্রেষ্ঠতর নয়। অথচ উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপর পড়বে; যে সাহিত্য শ্রেষ্ঠতর নয় তার প্রভাব পড়বে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের উপর, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তারপর, ইংরেজীকে বিদেশী ভাষা বলে জানতাম বলে এর প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্তা হারিয়ে ফেলতে আমরা দেইনি, কিন্তু যেহেতু উর্দু বিদেশী ভাষা নয়, এবং এই ভাষা ও সাহিত্যকে আমরা শ্রদ্ধা করি, এমনকি বোধহয় কেউ কেউ বাংলার থেকেও বেশী শ্রদ্ধা করি, সেহেতুই বিপদ আরো বেশী। এতে এমন সম্ভাবনাও আছে যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যকে বর্জন করে সম্পূর্ণভাবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করবো ; বাংলা সাহিত্যের আসর থেকে আমরা চিরবিদায় নেব। যেহেতু আমরা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং শ্রদ্ধান্বিত, সেহেতু সেই কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার বশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেই হয়তো আমরা একদিন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিলুপ্ত করে দিতে পারি, যার অর্থ হবে আমাদের মৃত্যু। এই সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের সকলকে—বিশেষত সাহিত্যিকদের সচেতন হতে হবে, এবং বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ না করার আরো একটা বড় কারণ আছে। আমরা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। স্বাধীনতা যদি সবদিক দিয়েই না পাওয়া যায় তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। অতএব, অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতাও পাওয়া দরকার। যে-ভাষাগত স্বাধীনতা পেলে আমরা আমাদের মনোভাব সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারবো, সে স্বাধীনতা যদি আমরা না পাই, তবে আমাদের মুখ আংশিকভাবে বন্ধ করে রেখেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে নাকি?

অবশ্য, উর্দু যে আমরা শিখবো না, তা নয় ; বরং এখনকার থেকে আরো শিখবো এর সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যের জন্য, উর্দু ভাষীদের জানবার জন্য। কিন্তু তাঁদের জানা কি শুধু আমাদেরই কর্তব্য, আমাদের জানা তাঁদের কর্তব্য নয়? কিন্তু আমাদের জানতে হলে আমাদের ভাষা শেখা এবং আমাদের সাহিত্য পাঠও তাঁদের অবশ্য কর্তব্য।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা এখনো কেউ বলতে পারেন না, কিন্তু কোন্ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে তা বলবার অধিকার সকলেরই আছে, এবং কোন্ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে ফলাফল কিরূপ হবে, তাও বলবার অধিকার সকলেরই আছে। আশা করি এ সম্বন্ধে কার কি মতামত তা জানতে পারবো।

আরো একটি কথা সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোকের অন্তরকে যদি জানতে হয়, তবে পশ্চিম-পাকিস্তানের নাগরিকগণকে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলক ভাবে জানতে হবেই। এক অংশের নাগরিক যদি অন্য অংশের নাগরিকদের না বুঝেন, তবে এক

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থ কিছুই থাকে না। অতএব, পূর্ব-পাকিস্তানকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে হলে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করা পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য-কর্তব্য এবং বাধ্যতামূলক কর্তব্য রূপে গণ্য না হয়ে পারে না। তাই যদি হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই যদি তাঁদের অধ্যয়ন করতে হয়, তবে পশ্চিম-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণ করতে আপত্তি কি? পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে, এতে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। পশ্চিম-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে শুধু তিন কোটি লোককে নূতন ভাষা শিখতে হয়, কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে প্রায় আট কোটি লোককেই নতুন একটা ভাষা শিখতে হবে।

''আজাদ''

৩০শে জুন ১৯৪৭

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে

পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা না পেলে স্বাধীনতার সার্থকতা সামান্যই। সেরূপ স্বাধীনতা আমাদের পেতে হবে। এর অর্থ এই যে, ভাষাগত স্বাধীনতাও আমাদের পাওয়া চাই। ভাষাগত স্বাধীনতা না পেলে বদ্ধ-মুখ অবস্থাতেই স্বাধীনতা পাওয়া হবে। অতএব আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। পাকিস্তানের আট কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকে কথা বলে বাংলা ভাষায়।[১] পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু, প্রগতিশীল এবং উন্নত ভাষা হচ্ছে বাংলা। অতএব আমাদের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তবু লক্ষ্য করেছি যে, কোনো কোনো লোকের ইচ্ছা উর্দু রাষ্ট্রভাষা হোক। পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্যই জানেন, অতএব তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতে পারেন। কিন্তু বাংলার লোক যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলছেন এটা আশ্চর্যজনক।

এটা অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং এরূপ মনোবৃত্তিকে সূচনায় নির্মূল করা কর্তব্য। স্বাধীনতার মর্ম যাঁরা জানেন না, পাকিস্তানের ভাষাগুলি সম্বন্ধে যাঁরা অজ্ঞ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের কিছুমাত্র দরদ নেই, এবং ভাষা-বিশেষকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল কি হতে পারে সে সম্বন্ধে যাঁরা অজ্ঞ, একমাত্র তাঁরাই বাংলাভাষী হয়েও অন্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতে পারেন।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তার ফলাফল কি রকম হবে, তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমাদের জাতির একটা বিলীয়মান যুগ থেকে আমরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

---

১ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য

ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ফলে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতির উপর ইংরেজীর আধিপত্যের সীমা নেই। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায়, এমনকি বোধ হয় এখনো পল্লী-অঞ্চলের আনাচে-কানাচে ইংরেজী 'নাছারার জবান'রূপে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, এবং 'নাছারার জবান' শিক্ষা হারাম বলে ফতওয়া থাকা সত্ত্বেও আমরা ইংরেজী বলতে পারলে কৃতার্থ জ্ঞান করি। কথায়-বার্তায় চিঠিপত্রে দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যথাসাধ্য এবং প্রাণপণে ইংরেজী ব্যবহার করে, নেহাৎ না জানা থাকলে অন্তত অনাবশ্যক দু'একটা শব্দ ব্যবহার করে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকি।

যে-ভাষাকে নাছারার ভাষা বলে ঘৃণা করেছি, যে-ভাষা শিক্ষা হারাম জ্ঞান করেছি, সেই ভাষা আমাদের এরূপ দাস-মনোভাবের জন্ম দিতে পেরেছে। কিন্তু উর্দুর প্রতি আমাদের সেরূপ বিতৃষ্ণা নেই; এরূপ অবস্থায় উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়, তবে তার ফলাফল বাংলাভাষীদের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক হতে পারে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। রাষ্ট্রভাষা বলে আজ আমরা যেমন প্রাণপণে এবং যথাসাধ্য ইংরেজী বলার, ইংরেজী জানার এবং ইংরেজীতে লেখার চেষ্টা করি, অন্তত দু'একটা ইংরেজী শব্দ বলারও চেষ্টা করি, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেও আমরা ঠিক তেমনি করব। বরং তার চেয়ে বেশী করব, কেননা ইংরেজীর মতো উর্দুর প্রতি আমরা বিতৃষ্ণা পোষণ করি না, এমনকি এ ভাষার প্রতি আমাদের বরাবরই একটা মোহ আছে। উর্দু ভাষা লিখতে হয় যে বর্ণমালায়, তা কোরআনের ভাষা আরবীর বর্ণমালা; উর্দু শব্দকোষে আরবী ও ফারসী শব্দের বহুল সমাবেশ এবং উর্দু ভাষায় গড়ে উঠেছে একটা সমৃদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য। এইসব কারণে উর্দু বাংলার মুসলিম জনসাধারণের কাছে পবিত্র ভাষারই সামিল। উর্দু ভাষায় খোতবা পর্যন্ত পঠিত হয় এবং সে খোতবার মূল্য তাদের কাছে আরবী খোতবার মূল্যের চেয়ে বোধ হয় কম নয়। শখ করে এবং বীরত্ব দেখাবার জন্যও অনেকে সময়ে অসময়ে উর্দু জ্ঞান জাহির করে থাকেন। উর্দু রাষ্ট্রভাষা না হওয়া সত্ত্বেও, এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় উর্দুর স্থান নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও উর্দুর এরূপ আধিপত্য। যদি উর্দু একবার রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষিত হয়, সকলের পক্ষে অবশ্য-শিক্ষণীয়

ভাষা বলে গণ্য হয়, যদি রাষ্ট্রভাষিক মর্যাদাহেতু উত্তম উর্দু জানার প্রতিযোগিতা একবার আরম্ভ হয়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা বাংলা ভালো করে জানতে, বলতে ও লিখতে চাইব না ঃ যেমন বর্তমানে বাংলা উত্তমরূপে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি না, যথাসাধ্য বাংলা বলি না, লিখি না। মাতৃভাষা উত্তমরূপে জানা, বলা এবং লেখা যে গৌরব-জনক তা ভাবতেই পারি না, কিন্তু ইংরেজী জানা, বলা ও লেখা গৌরব-জনক তা সার্বজনীনভাবে মান্য করে চলি। বাংলা যে জানি তা ভুলে থাকতে চাই। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেও আমরা তেমনি বাংলা ভুলে থাকতে চাইব এবং উত্তম উর্দু জানা, বলা ও লেখার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেব।

কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ এই যে, একদিন আমরা হয়ত বাংলা ভাষাকেই ভুলে যাব। বাংলা যে বাস্তবিকপক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা, একথা কেউ কেউ অস্বীকার করতে চান। তাঁরা বলতে চান যে, বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং সংস্কৃত হিন্দুর ভাষা, পৌত্তলিকতার ভাষা, পক্ষান্তরে উর্দু মুসলমানদের ভাষা, আরবী-ফারসীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য, অতএব মুসলমানদের ভাষা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে, হিন্দুর ভাষা বাংলা নেওয়া চলবে না। বাংলা ও উর্দুর প্রতি এরূপ মনোভাব নিয়ে কিছুদিন চললেই মাতৃভাষারূপে উর্দুকেই গ্রহণ করা এবং বাংলাকে বর্জন করা আমরা কর্তব্য মনে করে বসব।

যাঁরা বলেন যে, বাংলা হিন্দুর ভাষা এবং পৌত্তলিকতার ভাষা, মুসলমানদের ভাষা নয়, তাঁরা কেউ এই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন না। বাংলা ভাষার চর্চা করা গোঁড়া ব্রাহ্মণ একদিন রৌরব নরকের পথ প্রশস্ত করার উপায় বলে বর্ণনা করেছিলেন। সেদিন মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এবং সম্মানের স্থান লাভ সম্ভব হয়েছিল। বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন নয়, কিন্তু সে কথা থাক। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বলেই যদি বাংলা মুসলমানদের ভাষা না হয়ে হিন্দুদের ভাষা হয়, তবে দুনিয়ার কোনো মুসলমানকেই মুসলমান বলা চলে না, কেননা এমন একদিন ছিল, যেদিন তাদের কোনো পূর্ব-পুরুষই মুসলমান ছিল না।

[library stamp]

বাংলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভাষা এবং হিন্দু বাংলাভাষী অপেক্ষা মুসলিম বাংলাভাষীর সংখ্যা বেশী। বাংলা ভাষা পৌত্তলিকতারও ভাষা নয়, বাংলা একটা ভাষা মাত্র, যেমন আরবী, ফারসী, উর্দু বিভিন্ন ভাষা। কোনো সচেতন খাঁটি মুসলমানের ভাষাই পৌত্তলিকতার প্রভাবযুক্ত নয়। এরূপ প্রভাব যদি বাংলা ভাষায় বেশী থেকে থাকে, তবে তার কারণ প্রধানত হিন্দুরাই বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অংশ অপ্রধান। মুসলমানেরা প্রধান অংশ নিলেই এই প্রভাব হ্রাস পেতে থাকবে, যেমন আরবী ও ফারসী ভাষার বেলায় ঘটেছে। আরবী ও ফারসী মূলত ছিল পৌত্তলিক জাতি ও সংস্কৃতির ভাষা, ইসলামের প্রভাবে এই ভাষা দুটি হল ইসলামীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা। মাত্র এইটুকুই হল বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী, ফারসী ও উর্দুর পার্থক্য। বাংলা ইসলামীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হতে পারেনি যেহেতু মুসলমানেরা একে সেভাবে গ্রহণ করেনি, এবং অপর তিনটি ভাষা মুসলমানদের দানে ও তাদের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা নইলে এই ভাষাগুলোর মধ্যে উচ্চ-নিম্ন কোনো ভেদ নেই, কোনো ভাষাই কোনো ভাষা থেকে পবিত্রতর নয় বা অপবিত্রতর নয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা আজ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। স্বাধীন হওয়ার ফলে তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর হবে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারা দ্রুত অগ্রসর হবে এবং যেহেতু ঐ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু এই কারণে বাংলা সাহিত্য মুসলিম সংস্কৃতিরও বাহন হয়ে উঠবে। অতএব মুসলিম সংস্কৃতির ভাষাগত এলাকা পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃততর হবে।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তা' হবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে যেরূপ পশ্চাদপদ আছি, ভবিষ্যতে তার চেয়েও বেশী পশ্চাদপদ হয়ে পড়বো। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষা উর্দু সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে লেখক-সম্প্রদায় বাংলা অপেক্ষা উর্দুতেই সাহিত্য-চর্চায় অধিকতর মনোযোগী হবেন। ইংরেজী ভাষার পাঠকসংখ্যা বেশী হওয়ায় যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি লিখলেন ইংরেজীতে। তার ফলে

বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লেও বাংলা সাহিত্য তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তারপর উর্দু আমাদের মাতৃভাষা নয়। অতএব আমরা যতোই মনে-প্রাণে উর্দু সাহিত্যের চর্চা করি না কেন, উর্দুভাষীদের মতো উৎকর্ষের অধিকারী আমরা কখনই হতে পারবো না, আমরা চিরদিন পশ্চাদপদ হয়ে রইব।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা মনোনীত করার আগে এসব ফলাফল চিন্তা করে দেখতে হবে। আরো চিন্তা করে দেখতে হবে যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়ার দরুন আমাদের নিবিড়ভাবে জানা পশ্চিম-পাকিস্তানের নাগরিক-দের অবশ্য-কর্তব্য। তা যদি হয়, তবে আমাদের ভাষা শিক্ষা করা পশ্চিম-পাকিস্তানের নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। বাংলা ভাষা যদি তাদের শিখতেই হয়, তবে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে মনোনীত না করার কোনোই কারণ নেই, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবেই. তাতে তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি অন্যত্র বলেছি। এখানে শুধু এটুকুই বলবো যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা স্থির করার সময় ভাষাতাত্ত্বিকদের অভিমত নিতে হবে। একটা রাষ্ট্রের সব কাজই রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা হতে পারে না। রণনীতি নির্ধারণের জন্য যেমন রণবিশারদের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন, শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যেমন শিক্ষাবিদের, অর্থনীতির জন্য যেমন অর্থনীতিবিদের, তেমনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা স্থির করার জন্য তাঁদের অভিমত নিতে হবে, যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। এ বিষয়ে শুধু রাজনীতিকদের অভিমত গ্রহণীয় হ'তে পারে না। সব বিষয়েই তারা বিশারদ নন।

"ইত্তেহাদ"
২৭শে জুলাই, ১৯৪৭

মহানগর পাঠাগার ঢাকা

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা হচ্ছে। কেউ বলছেন রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, কেউ বলছেন উর্দু, আবার কেউ ইংরেজীর কথাও বলছেন।

রাষ্ট্রভাষারূপে এদেশে ইংরেজীর অবস্থান যে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ ছিল ইংরেজী ভাষা। নিজেদের সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু ভাষা থাকা সত্ত্বেও বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা জাতীয় সম্মানের পক্ষে হানিকর। অতএব এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে তাদের ভাষার আধিপত্যেরও অবসান করতে হবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে উর্দুর দাবি জোরালো হলেও, বাংলা ভাষার দাবির চেয়ে জোরালো নয়। সমগ্র পাকিস্তানের তিন ভাগের দুই ভাগ অধিবাসী পূর্ব-পাকিস্তানে বাস করে, এবং তাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাকিস্তানের বাকি এক ভাগ অধিবাসীরও সকলের মাতৃভাষা উর্দু নয়। তাদের মাতৃভাষা পাঞ্জাবী (পাঞ্জাব), সিন্ধী (সিন্ধু), ব্রাহুই (বেলুচিস্তান) এবং পস্তু (সীমান্ত)। তাদের মধ্যে উর্দুভাষী লোকও আছে, বিশেষত পশ্চিম-পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে। এই ভাষাগুলির কোনোটিই এক কোটির অধিক লোকের ভাষা নয়, কোনো কোনোটি আবার কয়েক লক্ষ লোকের ভাষা। অতএব এগুলির কোনো-টিকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তানের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগের অধিবাসীরই মাতৃভাষা বাংলা, সেহেতু রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি সর্বাপেক্ষা প্রবল বাংলা ভাষার।

কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসিগণ বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-

ভাষারূপে গ্রহণ করলে তাঁদের অসুবিধা হবে। প্রদেশ হিসাবে তাঁদের ভাষা বিভিন্ন হলেও, উর্দু'র সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

এই কারণে বাংলা এবং উর্দু এই দুই ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-রূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে, পাকিস্তানেও গ্রহণ না করার কারণ নেই।

আমাদের নারীসমাজ সাহিত্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তাঁরা আরও পশ্চাদপদ হয়ে যাবেন। অতএব পূর্ব-পাকিস্তানে যাতে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়, সেজন্য আমাদের নারীসমাজ সর্বত্র আন্দোলন করবেন আশা করি। এ বিষয়ে পাকিস্তান গণ-পরিষদস্থ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিশেষত মহিলা প্রতিনিধির গুরুতর কর্তব্য রয়েছে।

"বেগম"

৩রা আগষ্ট, ১৯৪৭

আরবী হরফে বাংলা

সম্প্রতি পাকিস্তান শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড-এর পেশোয়ার অধিবেশনে পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে একই হরফে লেখার সুপারিশ করা হয়েছে। 'একই হরফ' বলতে যে আরবী হরফকেই বুঝানো হয়েছে এবং পাকিস্তানের বাংলা ভাষাই যে এই সুপারিশের লক্ষ্য, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বস্তুত বোর্ডের অধিবেশনের অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলি আরবী হরফে লেখার সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে আসছেন এবং সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসে তিনি এই হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করে গেছেন।

এই সুপারিশকে যতই উদ্ভট মনে হোক না কেন, আরবী হরফের প্রতি সাধারণ মুসলমানের দুর্বলতার কথা মনে রাখলে এর সপক্ষে প্রচার-কার্যের ফলাফলের প্রতি উদাসীন থাকা ভুল হবে। বস্তুত ইতিমধ্যেই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মত-বিভেদের সূচনা হয়েছে। অনেকেই এই প্রচারণায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

আরবী হরফের পক্ষে এরূপ যুক্তি দেখানো হচ্ছে, যেন মনে হয় আরবী হরফে বাংলা লিখতে পারলেই পূর্ব-পাকিস্তানীদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে – তাদের সব দুঃখকষ্ট ভাবনা-চিন্তার অবসান হবে।

একটা যুক্তি এই যে, আরবী হরফে বাংলা লেখা হলে পশ্চিম-পাকিস্তানের এবং অবশিষ্ট মুসলিম জাহানের অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঐক্য-বন্ধন সহজতর এবং দৃঢ়তর হবে। এ যুক্তি বিচারসহ নয়। একই হরফের সঙ্গে পরিচিতি যদি বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের ঐক্য স্থাপনের সহায়কই হতো, তাহলে ইউরোপে যেখানে সকল জাতি একই হরফ ব্যবহার করে সেখানে একাধিক রাষ্ট্র থাকতো না, দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটতো না, এবং শতগুণে প্রলয়ঙ্কর আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের

জন্যও তারা তোড়জোড় করতো না। এক বর্ণমালার কল্যাণে সমগ্র ইউরোপ এতদিন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতো। খৃস্টান জগতের কথা বাদ দিলেও, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপন যাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল সেই আরবেরাও শতধা-বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর-তীর থেকে আরম্ভ করে পূর্বে ইরান-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আরবদেশগুলির ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঐক্য নেই। এর সঙ্গে ইরান ও আফগানিস্তান যোগ করলে অনৈক্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে চোখে পড়ে। শেষোক্ত দেশ দুইটির ভাষা আরবী (সংশোধিত) হরফে লিখিত হয়।

আরবী হরফ মুসলিম জাহানের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঐক্য-বন্ধন দৃঢ় করবে, এ যুক্তির দুর্বলতা আরও পরিষ্কার হয়, যখন একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যায় যে, দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমানই আরবী হরফ ছাড়া তাদের কাজ-কর্ম চালিয়ে থাকে। তুরস্কের দুই কোটি, সোভিয়েট রাশিয়ার দুই কোটি এবং চীনের কমবেশী দুই কোটি মুসলমান আরবী হরফ ব্যবহার করে না। আলবেনিয়ার আট লক্ষ এবং যুগোস্লাভিয়ার পনের লক্ষ, বুলগেরিয়ার আট লক্ষ এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানও আরবী হরফ ব্যবহার করে না। ইন্দোনেশিয়ার ৭ কোটি মুসলমানের সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা বলা চলে। মোটের উপর আরবদেশগুলির ৫ কোটি অধিবাসী ও প্রবাসী এক-আধ কোটি আরব ব্যতীত আর কারো মাতৃভাষা আরবী নয় এবং ইরান, আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া আর কোথাও আরবী হরফ বহুল প্রচলিত নয়। অতএব আরবী হরফ দিয়ে মুসলিম জাহানে সেতুবন্ধনের কথাটা অনেকখানিই ফাঁকা।

আরবী হরফের পক্ষে আরেকটা খুব বড় যুক্তি দেখানো হয় যে, কোরআনের হরফ বলে পাকিস্তানের অধিবাসীরা অধিকতর আগ্রহে এই হরফে লেখাপড়া করবে, অতএব জনসাধারণের অশিক্ষা দূরীকরণের এটাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা। এটাও কোন যুক্তি নয়। তা যদি হতো, তবে আরবী ভাষাভাষী দেশগুলিতে এবং ইরান ও আফগানিস্তানে একটি লোকও অশিক্ষিত থাকতো না। কিন্তু এই দেশগুলিতে অশিক্ষিতের হার

খুব বেশী। মিসর ব্যতীত আর কোন আরব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, লেবানন ও সিরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মার্কিন ও ইউরোপীয় পাদ্রীদেরই সৃষ্টি। ইসলামের জন্মভূমি খাস সৌদী আরবে বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, একটি কলেজও নেই। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সৌদী আরব পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদবর্তী—অত্যন্ত অপ্রীতিকর হ'লেও একথা সত্য।

আরবী হরফের মারফত বিশ্ব-মুসলিম সমঝোতার কথাটাও ফাঁকা, কেননা শুধু হরফের মারফত সমঝোতা হয় না, হলে ইউরোপীয় জাতি-গুলির চেয়ে বেশী হওয়ার কথা নয়। এই হাল্কা যুক্তি প্রয়োগের সময় আরেকটা সত্য চোখ এড়িয়ে যায়, তা এই যে, "ভাষা" আর "হরফ" এক জিনিস নয়। ভাষার মারফতেই সমঝোতা হয়; হরফের মারফত নয়।

আরবী হরফের মারফত বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য সাধন এবং অশিক্ষা দূরীকরণ কোনোটাই যদি দ্রুততর ও সহজতর না হয় তবে এই হরফের সপক্ষে এত প্রচারণার সার্থকতা কি? আরবী হরফের পক্ষপাতীরা কি এই কথা বোঝেন না? না বুঝেই কি তাঁরা এই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন?

সম্ভবত উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেওয়া থেকে আরবী হরফের সপক্ষীয় প্রচারণাকে স্বতন্ত্র করে দেখা যায় না। পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এখন আরবী হরফের নাম করে উর্দু অনুপ্রবিষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যথায়, যে-গভর্নমেণ্ট পূর্ব-পাকিস্তানে শত শত প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছেন, যে-গভর্নমেণ্টের আমলে ছাত্ররা যথেষ্ট ছাত্রাবাস পাচ্ছেন না, শিক্ষকেরা উপযুক্ত বেতন পাচ্ছেন না, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত মিলছে না, সে-গভর্নমেণ্ট দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যাকুল হয়েই অশিক্ষার বিরুদ্ধে আরবী হরফের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন কেউ-ই মনে করবেন না। আসলে আরবী অক্ষরের প্রতি মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খিড়কির পথে তাদের উর্দুতে দীক্ষিত করে নেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

এই উপায়ে পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমানদের সকল প্রকার "হিন্দু" প্রভাবের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের মন থেকে বাঙালিত্ব-বোধের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলা সহজ হবে।

কিন্তু আরবী হরফের মারফত এ-সকল উদ্দেশ্য সফল হোক আর না হোক তাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা সকল দিক দিয়েই যে বিপন্ন হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে আর বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে উর্দু বাঙালী মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা হবে, না বাংলা হবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়ে তারা হিন্দুদের অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ হয়ে রয়েছে। এখন আরবী হরফ আর উর্দু ভাষা গ্রহণের প্রশ্ন নিয়েও তাদের অবাঙালী উর্দুভাষীদের অপেক্ষা পশ্চাদপদ থাকতে হবে, কেননা উর্দু তাদের মাতৃভাষা নয়, কাজেই এক্ষেত্রে তারা কখনোই উর্দুভাষীদের সমকক্ষ হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়ে তাদের পশ্চিম-বাংলার বাঙালীদের অপেক্ষাও পশ্চাদপদ থাকতে হবে। তারা অবাঙালীও হতে পারবে না, বাঙালীও থাকতে পারবে না, যেমন মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষার ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বাঙালিত্ব হারিয়ে ছিলেন কিন্তু সাহেব হতে পারেননি।

আমরা এমন কথা বলতে চাই না যে পূর্ব-পাকিস্তানীদের উর্দু ও আরবী শিখতে হবে না। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব এই যে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা হিসাবেই এইসকল ও অন্যান্য উন্নত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হোক এবং পূর্ব-পাকিস্তান তথা আর-সব প্রদেশেরই শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হোক। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে বিকাশের সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া হোক। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষাকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া অস্বাভাবিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

বাংলা বর্ণমালার ত্রুটিই যদি এর প্রতি কর্তৃপক্ষের বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে থাকে তবে তাঁরা এর সংশোধনের চেষ্টা করতে পারেন।

কিন্তু সেপথে পাকিস্তানের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড যাননি (বোর্ডে কতজন বাঙালী প্রতিনিধি এবং বাংলাভাষাবিদ আছেন তা আমাদের

জানা নেই।। আরবী হরফের সপক্ষীয়রাও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সংশোধন না করে খাঁটি আরবী হরফ তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না। পাকিস্তান, পাঞ্জাব, পেশোয়ার, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, করাচী, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি শব্দ লিখতে গিয়ে তাঁরা প, চ, ধ, ট (এবং আরও অনেক) অক্ষর আরবী বর্ণমালায় পাবেন না। যদি আরবী হরফই সংশোধন করতে হয়, তবে বাংলা হরফ সংশোধনে তাঁদের আপত্তি কেন?

এ সম্পর্কে আমাদের আরও বক্তব্য এই যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের আন্তরিক উদ্যম এবং সুব্যবস্থা থাকলে তবেই গণশিক্ষা দ্রুততর হতে পারে। এককভাবে বর্ণমালা বিশেষের অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী উৎকর্ষ দ্বারা অবস্থার তারতম্য হতে পারে না।

আমাদের সরকারের এরূপ উদ্যম ও সুব্যবস্থা আছে একথা কিছুতেই বলা যায় না। যদি তা না থেকে থাকে তবে আরবী হরফ প্রবর্তন করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু অরাজকতারই সৃষ্টি করা হবে। এই প্রদেশের অধিবাসীরা সকলেই আরবী হরফ সমর্থন করবেন না, এবং বিশেষত শিক্ষিত বায়োপ্রাপ্তগণ নতুন করে আরেকটি হরফ আয়ত্ত করার উদ্যম অনুভব করবেন না। ফলে আরবী-হরফ-জানা এবং না-জানা সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হবে, ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যই পাকাপোক্ত হবে। আরবী হরফের প্রতি সরকারী সমর্থন থাকায় এই হরফ-জানা ব্যক্তিগণ বিশেষত অবাঙালিগণ, সরকারের নিকট থেকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

প্রকাশ-ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিকতা ও সহজসাধ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা হরফ আরবী হরফের চেয়ে অপকৃষ্ট একথা বলা চলে না। আরবী অপেক্ষা বাংলার শব্দধ্বনি বেশী হওয়ায় প্রকাশ-ক্ষমতা বেশী। টাইপ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাংলার চেয়ে আরবী অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না, হরফের সংস্কার করলে বাংলার বৈজ্ঞানিকতা ও সহজ-সাধ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে ঐক্য-অনৈক্যের কারণ ভাষা বা হরফ নয়, আসল কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক স্বার্থের সামঞ্জস্যই ঐক্যের প্রকৃত কারণ, এগুলির অসামঞ্জস্য থেকেই বিরোধের সূচনা হয়ে থাকে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা, পাকিস্তানের দু'দলের "সামঞ্জস্যীকরণ" প্রস্তাবের পেছনে কোনো বাস্তব দৃষ্টিরই অস্তিত্ব নেই।

দৈনিক "ইত্তেফাক"
১০শে মার্চ, ১৯৬৯

ঢাকা

ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি

পাকিস্তান আমলে ভাষা-আন্দোলনের পূর্ণ ইতিহাস রচনা এবং যথার্থ ব্যাখ্যা ছিল কঠিন, তথাপি ঐ সময়ে প্রশংসনীয় কাজ কিছু হয়েছিল। এরূপ প্রয়াসে যে-সব অসম্পূর্ণতা ছিল তার একটি কারণ রাজনৈতিক, আরেকটি কারণ প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যের অভাব। আরো একটি কারণ কালের পরিপ্রেক্ষিত: একাত্তরের আগে যা ছিল এক রকম, একাত্তরের পরে তা অন্য রকম।

সাধারণভাবে বলা হয় প্রথম ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে। শুধু সক্রিয় আন্দোলন অর্থেই এমন উক্তি করা সম্ভব, কিন্তু এরূপ আন্দোলনেরও একটা পশ্চাদভূমি এবং মানসিক প্রস্তুতির অধ্যায় থাকে। সভা-শোভাযাত্রায় উচ্চারিত শ্লোগানের আগের স্তরটি সমাজের সচেতন অংশে চিন্তার আকারে মৌল দাবিগুলির সঞ্চারণ এবং ভাষায় তার উচ্চারণ। আধুনিককালে যাবতীয় সক্রিয় আন্দোলনেরই সূচনা হয় এইভাবে। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসগুলির বিবরণ অনুযায়ী বাঙালী লেখকগণ বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এবং এ প্রয়াসের সূচনা ঢাকায়।[1] কিন্তু তা ঠিক নয়। এ প্রচেষ্টার শুরু আরো আগে এবং কোলকাতায়। ভাষা-আন্দোলনে লেখক-সমাজের অবদান কতখানি, এবং এ আন্দোলনের তাৎপর্য কি সে সম্বন্ধেও এসব ইতিবৃত্ত থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। বর্তমান আলোচনায় এসব বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। অবশ্য এই জাতীয়তাবাদ তখন রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না। তেসরা জুন ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের দু'টি বিচ্ছিন্ন অংশের মোটামুটি রূপরেখা বাস্তব রূপ নিয়েছিল (এই

রূপরেখার প্রাথমিক রোমান্টিক ধারণা লাহোর প্রস্তাবেই দেওয়া হয়েছিল) এবং এই বিচ্ছিন্ন দু'টি অঞ্চলের ভৌগোলিক দূরত্বের তাৎপর্য এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও রাজনৈতিক ব্যবধানের স্বরূপ তখনই উদ্‌ঘাটিত হয়নি। দু'অঞ্চলের মানসিক বিচ্ছেদের প্রশ্নও তখন ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের উন্মাদনা এবং সাম্প্রদায়িক তন্ময়তা, বিদ্বেষ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ তখন এইসব ব্যবধানের প্রশ্নকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। তা ছাড়া ঐসব ব্যবধানের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তখন হয়নি। কিন্তু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা বাঙালী মুসলিম সমাজে আগে থেকেই ছিল এবং মাউণ্ট-ব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার অব্যবহিত পরেও তার প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও উঠেছিল তখনই।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার সময় ভাবী পূর্ববঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরাট অংশই ছিলেন কোলকাতায়, পাকিস্তানের সমর্থক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকায় এবং বে-সরকারী সংস্থায় কর্মরত লেখক ও সাংবাদিকরাও ছিলেন ঐ মহানগরীতে। বামপন্থী মুসলিম তরুণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী (নেতৃস্থানীয় প্রধান অংশ) ছিলেন সেখানেই। বস্তুত কোলকাতা শুধু অখণ্ড বাংলাদেশের নয়, কিছু-দিন খণ্ডিত পূর্ববঙ্গেরও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল—আগ-ষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরে পরেই আসন্ন পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা তাঁদের দৈনন্দিন উত্তেজনাময় আলো-চনার বিষয়বস্তু ছিল। এইসব আলোচনার একটা প্রধান বিষয় ছিল রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন, কেননা ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে উর্দুকে পাকিস্তা-নের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলছে। সচেতন লেখকবৃন্দ তখনই এ প্রয়াসের বিরোধিতা করার এবং বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকে ব্যক্তিগত প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের একটা মূল কথা ছিল ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, সেই সঙ্গে অন্য চেতনাও ছিল, কিন্তু ঐ স্বাতন্ত্র্যচেতনাই ছিল মুখ্য।

দৈনিক ইত্তেহাদের সাহিত্য-বিভাগে ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন এবং ২৯শে জুন তারিখে দু'কিস্তিতে "বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, বাঙালীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণাই ছিল এর লক্ষ্য। এর প্রথম কিস্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, দ্বিতীয় কিস্তি আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে[২] :

> ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি শুধু ইংরেজীরই আধিপত্য দেখতাম, অন্য কোন ভাষার আধিপত্য না দেখতাম, তবে বলতাম তার কারণ ইংরেজীর ঐ রাষ্ট্রভাষিক মর্যাদা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার অতিমূল্যবানতা, এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাংলার নিয়তম স্থান নির্দেশ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাঙালীদের ব্যবহারিক জীবনে শুধু ইংরেজীর নয়, উর্দু এবং হিন্দীরও সমান আধিপত্য।

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, প্রবন্ধের প্রথম কিস্তির বক্তব্য ছিল বাঙালীর ইংরেজীয়ানা। বাঙালী জাতীয়তাবাদের কিছু অভিব্যক্তি ঐ অংশে থেকে থাকবে।

বিদেশী এবং অবাঙালীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাঙালী ভাষাগত এবং জাতিগত হীনমন্যতার পরিচয় দেন। তিনি কথা বলেন হয় ইংরেজীতে না হয় উর্দু-হিন্দীতে।

> প্রায় বাঙালী এটা মনে-প্রাণে জানেন যে, হিন্দী-উর্দু ভাষীর সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁকে হিন্দী-উর্দুতে বলতে হবে, কেননা অপর পক্ষ বাংলা জানেন না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এটা একটা বাধ্য-বাধকতা, এরূপ বাংলা জানা এবং বলার বাধ্যবাধকতা ও গরজ এখন পর্যন্ত অবাঙালীদের নেই।

কেন এমন হয়?

> এর প্রধান কারণ এই যে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়নি। তাঁর জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অত্যন্ত কাঁচা, তাঁর পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালীরা সাধারণতঃ বুঝতে পারেন না যে, নিজ বাসভূমেও ইংরেজ তথা অবাঙালীদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট

করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়।···আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ই উদ্যত হয়ে থাকে : আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজী-উর্দু-হিন্দী বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু-হিন্দীভাষীরা কেন বাংলা শিখতে বাধ্য হবে না?[৩]

বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন প্রথম আলোচিত হওয়ার মুহূর্তেই বাঙালী জাতীয়তাবাদ ব্যক্ত হয়েছিল এই প্রবন্ধে, ঈষৎ তীব্রতা এবং উষ্ণতার সঙ্গেই। অবশ্যই এই জাতীয়তাবাদের উপলক্ষ বাংলাভাষা : সম্ভবতঃ একে বলা চলে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ।

ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার একদিন পরে, ৩০শে জুন তারিখে 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল একই লেখকের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। সূচনায় বলা হয় :

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে,—কোন্ ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোন্‌টি, কোন্ ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে, এবং কোন্ ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী।···যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশী।··এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই, তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।[৪]

এরপর পাকিস্তানের ভাষাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দেওয়া হয় জনসংখ্যা, সাহিত্য ও প্রকাশক্ষমতার দিক দিয়ে, বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়, এবং বলা হয় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্য একমাত্র বাংলা ভাষাই।" এরপর উর্দুর প্রশ্ন

ঢাকা

আলোচিত হয়। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এমন কথা কেউ কেউ বললেও সরকারীভাবে বলা হয়নি, স্বাধীনতা তখনো আসেনি এবং পাকিস্তানে কোন সরকারই গঠিত হয়নি, কিন্তু বহু বছরের উর্দু-হিন্দী বিরোধ এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংগঠন ও স্বরূপের কথা স্মরণ করে বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ অনুমান করতে পেরেছিলেন (এবং এ ধরনের কথাও তখন রটেছিল) যে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সেটা হবে অসঙ্গত। পাকিস্তানে বাঙালীর চেয়ে উর্দুভাষীর সংখ্যা বেশী নয় "এবং ভাষাগত উৎকর্ষ ও সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে উর্দুর চেয়ে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠতর।" তা সত্ত্বেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে তার ফলাফল হবে অত্যন্ত অশুভ, বিশেষ করে বাঙালীর জন্য ক্ষতিকর। উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হলে ইংরেজীর স্থান নিবে উর্দু, এবং ইংরেজী না জানা যেমন সরকারী চাকরির জন্য অযোগ্যতা, উর্দু না জানা তেমনি অযোগ্যতা বলে গণ্য হবে এবং "পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাক্‌রির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।"[৫] অন্যদিকে উর্দু-শিক্ষিত মাত্রেই চাক্‌রির যোগ্য বলে গণ্য হবে। উর্দু সংবাদপত্রের মর্যাদা হবে বাংলা সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী। উর্দু শিখলেও বাঙালীরা কখনই উর্দুভাষীদের মতো উর্দু লিখতে-বলতে পারবেন না। অতএব সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের আইন-পরিষদে এবং অন্যত্র বাঙালীদের প্রভাব হবে উর্দুভাষীদের থেকে অনেক কম।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়ঃ "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করলে আমাদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি শুধু ব্যাহত হবে না, রুদ্ধ হয়ে যাবে।" কেননা ইংরেজ-আমলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব যেমন পড়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর, পাকিস্তান আমলেও তেমনি প্রভাব পড়বে উর্দুভাষা ও সাহিত্যের। কিন্তু ইংরেজী বাংলার থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাষা ও সাহিত্য, উর্দু তা নয়। তার ফলে ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধতর হয়েছে, উর্দুর প্রভাবে তা হবে না। কেননা—

> সাহিত্য হিসাবে উর্দু-সাহিত্য ইংরেজীর থেকে তো নয়ই বাংলা-সাহিত্য থেকেও শ্রেষ্ঠতর নয়। অথচ উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে

তার প্রভাব বাংলা-সাহিত্যের উপর পড়বে; যে সাহিত্য শ্রেষ্ঠতর নয় তার প্রভাব পড়বে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের উপর, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৬]

বিপদ শুধু সেদিক থেকেই নয়। বাঙালী সমাজ সব সময়েই জানতো ইংরেজী বিদেশী ভাষা এবং এই কারণে "এর প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সত্তা হারিয়ে ফেলতে আমরা দেইনি, কিন্তু যেহেতু উর্দু বিদেশী ভাষা নয়, এবং এই ভাষা ও সাহিত্যকে আমরা শ্রদ্ধা করি, এমনকি বোধ হয় কেউ কেউ বাংলার চেয়েও শ্রদ্ধা করি, সেহেতুই বিপদ আরো বেশী। এতে এমন সম্ভাবনাও আছে যে আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বর্জন করে সম্পূর্ণভাবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করবো; বাংলা-সাহিত্যের আসর থেকে আমরা চিরবিদায় নেব…যার অর্থ হবে আমাদের মৃত্যু।"[৭] এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত না উর্দু, তা নিয়ে এই বাংলাদেশেই একদিন প্রশ্ন উঠেছিল, এবং এককালে বাংলা পুঁথি লেখা হয়েছিল আরবী হরফে। উর্দু সমর্থন করার মতো রাষ্ট্রশক্তি সেকালে ছিল না বলে ও প্রশ্ন প্রাধান্য পায়নি, কিন্তু পাকিস্তানে উর্দু সমর্থক রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল নিশ্চিত।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল ঐ প্রবন্ধে।

> আমরা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। স্বাধীনতা যদি সবদিক দিয়েই না পাওয়া যায় তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। অতএব, অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতাও পাওয়া দরকার। যে ভাষাগত স্বাধীনতা পেলে আমরা আমাদের মনোভাব স্বচ্ছরূপে প্রকাশ করতে পারবো সে স্বাধীনতা যদি আমরা না পাই, তবে আমাদের মুখ আংশিকভাবে বন্ধ রেখেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে নাকি?[৮]

এর প্রায় এক মাস পরে, ২৭শে জুলাই তারিখের দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এ প্রকাশিত "উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধের কয়েকটি বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। ভাষাগত স্বাধীনতার উল্লেখ করে

বলা হয়েছিল "ভাষাগত স্বাধীনতা না পেলে বদ্ধমুখ অবস্থাতেই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে"।[৯] ভাষার প্রশ্নে বাঙালী মানসের হীনমন্যতার উল্লেখ করে বলা হয়েছিল 'নাছারার জবান' ইংরেজীর প্রতি বাঙালী মুসলমানের এককালীন বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও বাঙালী প্রাণপণে এবং যথাসাধ্য ইংরেজী বলার, ইংরেজী জানার এবং ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেন, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে উর্দু'র প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাঙালী মুসলমান তেমনি করবেন. বরং তার চেয়েও বেশী করবেন, কেনন আগে থেকেই এ ভাষার প্রতি তাঁর একটা মোহ আছে। উর্দু আরবী হরফে লেখা হয়, উর্দু ভাষায় খোতবা পর্যন্ত পঠিত হয়, এবং এসব কারণে উর্দু বাংলার মুসলিম জনসাধারণের কাছে পবিত্র ভাষারই সামিল। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মহলে বলা হয় বাংলা মূলতঃ হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দু-সংস্কৃতি ও পৌত্তলিকতার ভাষা, অতএব বর্জনীয়। পাকিস্তানে এই মানসিকতার প্রসার ঘটার সম্ভাবনা আছে এবং প্রসার ঘটলে বাঙালী মুসলমান হয়তো একদিন বাংলাকে বর্জন করে উর্দুকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করে বসতে পারে। কিন্তু বাংলাভাষা হিন্দুর ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর চেয়ে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এককালে এ ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদ্বেষ ছিল, মুসলিম রাজশক্তিই একে লালন করে সম্মানের আসন দিয়েছে। পৌত্তলিকতা কোনো ভাষার স্থায়ী লক্ষণ বা একমাত্র লক্ষণ নয়. কোন্ ধর্মাবলম্বী লেখক কোন্ ভাষায় কি পরিমাণে লিখেছেন তার উপরেই নির্ভর করে সে-ভাষার উপর কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব কতখানি। অন্যথায় "কোনো ভাষাই কোনো ভাষা থেকে পবিত্রতর বা অপবিত্রতর নয়।"[১০]

আসন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কেমন হবে তার আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২৭শে জুন তারিখে সাপ্তাহিক "মিল্লাত" এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল : "পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।" কিন্তু ঐ সময়ে এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল যে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। এই 'কানাঘুষার' কথা উল্লেখ করে উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল :

একটা দেশকে পুরাপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে তার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।[১১]

মাহবুব জামাল জাহেদী ২০শে জুলাই তারিখের দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এ প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধে[১২] বলেন, সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একমাত্র উর্দু এবং একমাত্র বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব উভয়ই অযৌক্তিক হবে। উর্দু বাঙালীদের কাছে প্রায় বিদেশী ভাষা; এবং এ ভাষা বিশেষভাবে মুসলমানী ভাষা তাও নয়। উর্দু, অধিকন্তু তুলনামূলকভাবে জটিল অথচ অনুন্নত ভাষা। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা হলেই সুবিচার হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কি হবে, সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে লেখক আসতে পারেননি।

আশ্বিন সংখ্যা (১৩৫৪) "সওগাত" এ কবি ফররুখ আহমদ "পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে-কথা উঠেছিল সে-সম্পর্কে তিনি বলেন:

গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব-পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি অবশ্য ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারের জন্যই রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।"[১৩] কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত "কৃষ্টি' নামক মাসিক পত্রিকার কার্তিক (১৩৫৪) সংখ্যায় "পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা বলে বর্ণনা করেন, এবং এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। "উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।"[১৪] রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িত। উর্দু ইসলামী সাহিত্যে সমৃদ্ধ, উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা দরকার ডঃ এনামুল হক এইসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করেন, এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য উর্দু ও পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব করেন।[১৫] 'এক রাষ্ট্রে একাধিক (রাষ্ট্র) ভাষা অচল এই শ্রেণীর ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক' এই উক্তির পর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন ঃ

> ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে।...উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মরণ,—রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর-ভারতীয় এবং পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।

উর্দুকে বিদেশী ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সমপর্যায়ে স্থাপন এবং একমাত্র

উর্দু রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবকে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা লক্ষণীয়।

"সওগাত"-এর অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে[১৬] কাজী মোতাহার হোসেন বলেছিলেন বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত: পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু (অথবা পশতু) এবং পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা। যদি তা না করা হয়, যদি উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ-রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের কবলে গিয়ে পড়বে। সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশীদিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।[১৭]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী "সওগাত"-এর পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) সংখ্যায় "শিক্ষার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, (ক) 'বাংলা হবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার স্বাভাবিক বাহন,' এবং (খ) 'উর্দু নিঃসন্দেহে হবে নিখিল পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সরকারী ভাষা।' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের প্রথম উক্তিতে দৃশ্যতঃ বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি স্বীকার করা হলেও, দ্বিতীয় উক্তি বহুলাংশে কার্যত তাঁর প্রথম উক্তির বিরোধী। বৃটিশ আমলে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নয়, প্রাদেশিক সরকারের ভাষা এবং শিক্ষার বাহনও ছিল ইংরেজী। ওয়াজেদ আলী সাহেব এই বৃটিশ নীতি অতিক্রম করে খানিক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন মাত্র, তথাপি বাঙালীকে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই শিখতে হবে এই প্রশ্ন ছিল, যা পশ্চিম-পাকিস্তানীদের বেলায় ছিল না। কিন্তু উর্দু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল সরকারের ভাষা হবে এবং সম্ভবতঃ কালক্রমে ইংরেজীর অনুরূপ উর্দুই হবে শিক্ষার মাধ্যম, এমনকি পূর্ব-

[library stamp]

পাকিস্তানেও, গোঁড়া পাকিস্তানী মহলের এই চিন্তা থেকে তাঁর চিন্তা খানিকটা অগ্রসর ছিল এবং এইটুকুই বাংলার সপক্ষে গিয়েছিল. এর বেশী নয়।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হবে উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (সরকারী ভাষা) ও শিক্ষার বাহন হবে বাংলা, এ ছিল "সওগাত"-এরই অভিমত।[১৮] এই অভিমত ঐ পত্রিকাকে রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার এক কানাগলিতে নিয়ে গিয়েছিল, যা ছিল "সওগাত"-এর মতো প্রগতিবাদী পত্রিকার পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বাংলাদেশে যে ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল তার দাবি ছিল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে। "সওগাত"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই দাবিকে সমর্থন করা হয়নি। বলা হয়েছিল ঃ

> উর্দুকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হইতেছে এবং সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক করা সঙ্গত হইবে। ইংরেজীর স্থলে উর্দুই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা (lingua franca) হইবে এবং হওয়া উচিত।…উর্দুর বিশেষ সম্মান যেন আমরা ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর না হই।[১৯]

পক্ষান্তরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় এবং কার্জন হলে সমাবর্তন অভিভাষণে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ভাষা বাংলা সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, "সওগাত"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে তা সমর্থন করা হয়েছিল।[২০] এ সম্বন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী নিজে যে অভিমত পোষণ করতেন, তার সূত্র ধরেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

একমাত্র-উর্দু রাষ্ট্রভাষার পেছনে পশ্চিম-পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানে আগত উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক মনোভাব তো ছিলই. সেই সময়ে বাঙালী সমাজের একাংশের উর্দুমুখী মানসিকতাও ছিল তাদের পক্ষে। "উর্দুর বিশেষ সম্মান যেন আমরা ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর না হই," 'সওগাত'-এর এই উক্তি ছিল ঐ

মানসিকতারই পরিচায়ক। 'সওগাত' তথা বাঙালী সমাজের ঐ অংশের কথা ছিল, স্বাধীন ভারতে উর্দুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় উর্দুর প্রতি পাকিস্তানের (পূর্ব-পাকিস্তানসহ) উপর একটা নৈতিক দায়িত্ব বর্তিয়েছে, এবং উর্দু ইসলামী সাহিত্যে সমৃদ্ধ। ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যও পাকিস্তানীদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু। (ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে এইসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করেন।) তা ছাড়া অনেক বাঙালী মুসলমানের কাছে বাংলার চেয়ে ইংরেজী ও আরবীর মতোই উর্দুরও সম্মান ছিল বেশী। গোলাম মোস্তফার মতো বিশিষ্ট বাঙালী কবিও উর্দু রাষ্ট্র ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, পাকিস্তানী তথা ইসলামী জাতীয়তাবাদের প্রেরণায়। এই বাস্তবতার কথা স্মরন না রাখলে ঠিক বোঝা যাবে না, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে কিরূপ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

২

১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকে প্রথম সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের প্রাক্কাল অবধি কয়েক মাস যাবত কোলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একমাত্র-উর্দুর বিরুদ্ধে এবং বাংলা ভাষার সপক্ষে যে-সব প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু বিবরণ প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেওয়া হলো।[২১] জুলাই মাস থেকে ঢাকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যে-সব আলোচনা ও প্রচার অভিযানের আয়োজন করেছিল, বিভিন্ন লেখক তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[২২] এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করব মাত্র।

জুলাই মাসে ঢাকায় মুসলিম লীগের বামপন্থীদের নিয়ে 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় 'বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'[২৩] তাঁদের এ প্রস্তাব ছিল গঠনোন্মুখ রাষ্ট্রের প্রাথমিক রূপরেখার একটি অংশ মাত্র।

কিন্তু এর পরেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে ওঠে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দীনের একটি বিবৃতির ফলে। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। জুলাই এর শেষদিকে দৈনিক "আজাদ"-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে, এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। আরবী এবং ইংরেজীকেও তিনি অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই সময় তিনি যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন একথা বলা কঠিন; তবে এ প্রশ্নে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব এখানে যে তিনি একমাত্র উর্দু-রাষ্ট্রভাষার দাবিকে সমর্থন করেন নি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে তমদ্দুন মজলিস বাংলার দাবির সপক্ষে প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত এই সংস্থা ঐ মাসে বাংলা ভাষার দাবির সমর্থনে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাসেমের রচনা সংকলিত হয়। তমদ্দুন মজলিসে ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাবের মূল কথা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অফিস ও আদালতের ভাষা অর্থাৎ সরকারী ভাষা ও শিক্ষার বাহন হবে বাংলা। কাজী মোতাহার হোসেনের "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ সংখ্যা "সওগাত"-এও প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকরীর অযোগ্য হইয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।

উল্লেখনীয় যে প্রায় আড়াই মাস আগে ৩০শে জুন তারিখে দৈনিক "আজাদ"-এ প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে ঠিক অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছিল উর্দু না জানার জন্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা সরকারী চাক্‌রির অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবেন।

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে, একমাত্র-উর্দু-রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখক-সম্প্রদায়ই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রথমে কোলকাতা থেকে, তারপর ঢাকা থেকে। বাঙালী-অবাঙালী-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দুর সপক্ষে, শিক্ষিত-সমাজ এবং ছাত্র-সমাজেরও একটা বড় অংশ ছিলেন তাই। সমাজের এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে না পারলে ভাষা-আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হতো না; লেখকসমাজ এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছিলেন। একমাত্র-উর্দু-রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব-বাংলার উপর কিরূপ অবিচার হবে এবং তার সংস্কৃতি-জীবনে কিরূপ সঙ্কটের সৃষ্টি হবে সেদিকে তাঁরা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির সপক্ষে অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সবই তাঁরা করেছিলেন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে তাঁদের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বাসনা ব্যক্ত করার পূর্বেই। শাসক-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক-সমাজ এমনিতেই সচেতন ছিলেন; স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাস থেকে তাঁদের এই চেতনা এসেছিল। অধিকন্তু লীগ-নেতৃত্বের এবং সরকারী কাঠামোর সংগঠন তাঁদের এই চেতনাকে তীক্ষ্ণতর করেছিল। একাদিক্রমে কয়েক মাস ধরে বাংলা ভাষার সপক্ষে তাঁরা লিখেছিলেন; প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রয়াসে শিক্ষিত ও ছাত্র-সমাজ বাংলা ভাষার দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, এবং এভাবেই ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে যে চাক্‌রির ক্ষেত্রে বাঙালী অসুবিধায় পড়বে, তার লক্ষণ প্রকাশ পেতে বেশী দেরী হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাংলাদেশে সরকারী চাক্‌রিতে যে হিন্দু-আধিপত্য ছিল, দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হয়, অধিকাংশ হিন্দু কর্মচারী ভারতে চলে যাওয়ায়। একই সঙ্গে ইংরেজের আধিপত্যেরও অবসান হয়। কিন্তু

দেশ-বিভাগ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে তো বটেই চাকুরির ক্ষেত্রেও উর্দুভাষী তথা পাকিস্তানীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা যেন বাঙালীদের চাইতে উন্নততর জাতের লোক এরূপ মনোভাব তাঁদের আচরণে প্রকাশ পায়। স্বভাবতই চাকুরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালী সুবিচার পাবে না, এই আশঙ্কা বাঙালী সমাজে ঘনীভূত হতে থাকে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের চূড়ান্ত রূপলাভের পূর্বেই বাংলা রাষ্ট্রভাষা দাবির পেছনে ছিল ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, অধিকন্তু প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে চেতনা। বাঙালী উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের অধিকারী না হলে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে ভাষা-আন্দোলন হয়তো হতো না। প্রবন্ধের প্রথমাংশে উল্লেখিত দৈনিক আজাদ'-এ প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, "সিলেটের গণভোটে আমাদের জয় হলে এবং সীমা নির্ধারণ-রায়ের ফলে আপাত-নির্দিষ্ট পূর্ব-পাকিস্তানের সংলগ্ন মুসলিম অঞ্চলগুলো এর সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ কোটিরও কিছু বেশী। এই পাঁচ কোটির প্রায় সবই বাংলাভাষী, পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কিছু কমবেশী তিন কোটি, এবং ভাষা হিসেবে এই তিন কোটি লোকও আবার প্রধান চারভাগে বিভক্ত।"[২৪] তখন যে রকম মনে করা হচ্ছিল সে-ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের সীমা-নির্ধারণ করা হয়নি। যে-সব মুসলিম-প্রধান এলাকা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে অথবা অন্তর্ভুক্ত করা হবে মনে করা গিয়েছিল তার কতকগুলি সীমা-নির্ধারণ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও ১৫ই আগষ্টে পাকিস্তানের যে রূপ দাঁড়িয়েছিল তাতে নতুন রাষ্ট্রে বাঙালীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং বাঙালীর বসবাস পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন একক একটি ভূভাগে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের পেছনে সচেতনভাবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেতনা এবং একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে স্বাতন্ত্র্যবোধ কাজ করেছিল।

১৯৫১ সালের আদম-শুমারিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠির আনুপাতিক হার দেওয়া হয়েছিল এই রকম ঃ[২৫]

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

	শতকরা হার
বাঙালী	৫৪·৬
পাঞ্জাবী	২৮·৪
উর্দু ভাষী	৭·২
সিন্ধী	৫·৮
পশতু	৭·১
ইংরেজী	১·৮

(মোট ১০৪·৯, কারণ অনেকেই নিজেদের দ্বিভাষী বলে জানিয়েছিলেন।)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় জনসংখ্যার কোন সঠিক হিসাব নির্ণীত হয় নি, কিন্তু বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল অভ্রান্ত, উর্দু পাকিস্তানের বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ছিল না, এবং পাকিস্তানের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাই ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নত। এইসবই ছিল বাংলা ভাষার সপক্ষে বড় যুক্তি। অল্পদিন পরেই দেখা গেল পাকিস্তান সরকার এসব যুক্তি মানতে রাজী নন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা দেশের প্রশাসনযন্ত্রসহ বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে উর্দুভাষীসহ অন্যান্য পাকিস্তানীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষাগত সংঘাতের এইটা ছিল প্রত্যক্ষ এবং সব চেয়ে বড় কারণ।

লেখক-সমাজ একমাত্র-উর্দু-রাষ্ট্রভাষার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষার সপক্ষে বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না, এবং প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের আগে এই আন্দোলনের লক্ষ্য-নির্ধারণ হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু আগে থেকে প্রথম ভাষা-আন্দোলন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরকার-পক্ষীয় অভিমতসহ যে-সব অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল তা ছিল এই রকম:

১. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হবে একমাত্র উর্দু। এই ছিল জিন্নাহ্ সাহেব এবং পাকিস্তানের নীতি। সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব-বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা হবে কিনা তা ঠিক করবেন এ দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

বাংলাদেশের মানুষ এই নীতি মেনে নেয়নি ; ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল এ নীতির বিরোধিতা।

২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। এর অর্থ ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে দৈনিক "আজাদ"-এ প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই দাবিই জানানো হয়েছিল। এ ছিল প্রায় চরম দাবি, দু'একজনের বেশী লেখক এরূপ দাবি জানাননি, কিন্তু উর্দুর প্রতি বাঙালীর মোহ ভাঙতে, ভাষা হিসাবে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং অন্ততঃ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবির সমর্থনে এই অভিমতের একটা ভূমিকা ছিল।

৩. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, উর্দু, ইংরেজী এবং আরবী। পূর্ব বাংলার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। ডঃ শহীদুল্লাহ্ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এটি অবাস্তব দাবি, এর ফলে বাংলার দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে একই সঙ্গে একমাত্র-উর্দুর দাবিও দুর্বল হয়, এই ছিল এ অভিমতের ভূমিকা।

৪. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা (রাষ্ট্রভাষা) এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত উর্দু, উর্দুকে একটা সম্মান দেওয়া উচিত, কিন্তু পূর্ব-বাংলায় রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং 'সওগাত" এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের নীতির সঙ্গে এ অভিমতের বেশ খানিকটা সাদৃশ্য ছিল। এই অভিমত কার্যকর হলে পশ্চিম-পাকিস্তানের কারো বাংলা শেখার বাধ্যবাধকতা থাকত না। একমাত্র-উর্দু-রাষ্ট্রভাষা পূর্ব বাংলায় চালানো অসঙ্গত হবে, এবং এখানে বাংলা হবে শিক্ষার মাধ্যম, মাত্র এইটুকু ছিল এ অভিমতের বক্তব্য।

৫. পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। প্রাদেশিক সরকার এই নীতি অনুসরণ করবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি

ও ভাষা কি হবে সে সম্বন্ধে এই অভিমত সুস্পষ্ট ছিল না। তবে এই অভিমত পরবর্তী ষষ্ঠ অভিমতের খুব কাছাকাছি।

৬. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। পূর্ব-বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বাঙালী উর্দু শিখবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর জন্য। একই প্রয়োজনে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা শিখবে বাংলা। এই ছিল (তমদ্দুন মজলিসসহ) অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অভিমত।

এইসব অভিমতেরই বিস্তারিত ভাষ্য সম্ভব ঃ মোটামুটিভাবে বলা চলে, ষষ্ঠ অভিমতই হয়ে উঠেছিল ভাষা-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্য নিছক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, চাকুরী তথা অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানে বাঙালীর মর্যাদা, বিশেষ একটি মানবগোষ্ঠি হিসেবে বাঙালীর সমগ্র ভবিষ্যৎই রাষ্ট্রভাষা-চিন্তার অন্তর্গত ছিল, এবং সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এইসব বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল। যাবতীয় তাৎপর্যসহ ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্য, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর থেকে ক্রমে ক্রমে আলোচনা ও সক্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের মার্চের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধ মারফত যে-সব ধারণা প্রচার লাভ করেছিল এবং প্রথম সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের ফলে দৃঢ়মূল হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ ধর্মীয় সাহিত্য বা অন্যান্য কারণে উর্দু অধিকতর সম্মানীয় ভাষা এরূপ ধারণা অযৌক্তিক; বাংলাভাষা ও সাহিত্য অধিকতর উন্নত এবং বাংলাভাষা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা, সে হিসাবে এই ভাষাই সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তথাপি পাকিস্তান সরকার এই ভাষাকেই দূরে ঠেলে রাখছেন, তাঁরা উর্দু ভাষা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানীদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করছেন; এ নীতি গণতন্ত্র-বিরোধী, এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুরূপ। একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে, এবং বাংলার দাবী বাতিল হলে বৃটিশ শাসনের অবদানে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না, বাঙালীরা

[stamp] ঢাকা

ইংরেজদের পরিবর্তে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের অধীনে গিয়ে পড়বে মাত্র। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলা ও উর্দু এই উভয়ই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এইভাবেই বায়ান্ন সালের দ্বিতীয় ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্য, মানসিকতা ও ভিত্তিমুল প্রস্তুত হয়েছিল আটচল্লিশের মার্চের মধ্যেই।

৩

ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা কার্যকরকরণ এবং পাকিস্তান সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তিকায় যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কয়েকটি লক্ষণ পরিস্ফুটিত: ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার তীব্র ইচ্ছা, এ ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী হিসাবে অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ। সাক্ষাৎভাবে উর্দু উপনিবেশবাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে এই ভাষা ও সংস্কৃতিগত জাতীয়তাবাদের উদভব এরূপ তাৎক্ষণিক ছিল না। এর মূল ছিল আরও গভীরে এবং বেশ খানিকটা অতীতে প্রসারিত।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বাংলা সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনার অস্তিত্ব ছিল, বিশেষ করে আধুনিক যুগে। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের চিত্রটি মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুখকর ছিল না, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে। আরেকটি অভিযোগ ছিল বহু শতাব্দী যাবৎ পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের প্রতি হিন্দু লেখকগণ উদাসীন এবং এই সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের বিপুল রচনাপুঞ্জে মুসলিম সমাজ প্রায় অনুপস্থিত এই অভিযোগ ত্রিশের দশক অথবা তার আগে থেকেই করা হচ্ছিল (যদিও এরূপ অভিযোগের সপক্ষে প্রবল যুক্তি ছিল না)। তৃতীয় অভিযোগ ছিল, মধ্যযুগে প্রধানতঃ বাংলার মুসলিম সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, এবং দৌলত কাজী ও আলাওলের আগে থেকেই মুসলিম কবিকুল বাংলা কাব্যের সাধনা করে আসছেন, তাঁরা বাংলা

কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, মুসলিম পল্লীকবিদের অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ উদারভাবে তা স্বীকার করেছেন এবং আধুনিকযুগে রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনায় এবং আলোচনায় মুসলিম অবদানকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হতো না, অথবা উপেক্ষা করা হতো। অন্ততঃ এইরূপ ধারণা মুসলিম সাহিত্যিক-মহলে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-সমিতি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ অথবা এই ধরনের সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা গঠন, এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান. মুসলিম পুঁথি-সাহিত্য, মুসলিম বাংলা সাহিত্য অথবা এই ধরনের সম্প্রদায়ভিত্তিক সাহিত্য-আলোচনা ছিল ঐসব অভিযোগের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। মুসলিম সমাজের এইসব সাহিত্য-প্রয়াস এবং সাহিত্য-নিরীক্ষা ছিল মূলতঃ হিন্দু লেখকসমাজের উপেক্ষারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম সাহিত্য-সাধনার প্রতি উপেক্ষার জন্য হিন্দু সাহিত্যিকদের দায়ী করা যায়, তবে পুরোপুরি নয়। এই উপেক্ষার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাসের গতিধারাও খানিকটা দায়ী বৃটিশ আমলে, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে অর্থনৈতিকভাবে অভিজাত মুসলিম সমাজ প্রায় বিধ্বস্ত হয় এবং হিন্দু বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠে। এই কারণে এবং মুসলিম শাসনের তিরোধানজনিত হতাশায় এবং ইংরেজ ও ইংরেজীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমান পিছিয়ে পড়ে। একদিকে যখন নবোদ্ভূত হিন্দু বিত্তশালী ও মধ্যবিত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পশ্চিমী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে হিন্দু সমাজ মহান সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত ও রেনেসাঁর দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত এবং শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলিম সমাজ মধ্যযুগীয় আবেশে আচ্ছন্ন। মুসলিম সমাজের যদি এই অবস্থা না হতো, যদি অর্থনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সমাজ একই পর্যায়ে থাকতো এবং হিন্দু সমাজের অনুরূপ অগ্রসর হতে পারতো, এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনুরূপ সৃষ্টিশীল ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো, তাহলে হিন্দু লেখকগণ মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াসকে উপেক্ষা করতে

পারতেন না। কিন্তু এটা হলো চিত্রের একটা দিক। অন্যদিকে ছিল সাম্প্রদায়িক অনুভূতি, সমাজের সর্বস্তরে, এবং এই অনুভূতির জন্যই মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াস হিন্দু লেখকদের দ্বারা বহুলাংশে উপেক্ষিত হতো। দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এবং আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাহিত্য-কর্মীর প্রয়াসে কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াসের একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, আর এজন্য মুসলিম সাহিত্যানুরাগী মহলে একটা গৌরববোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল আধুনিক কৃতিত্ব। অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতো সাহিত্যেও বিষয় নির্বাচন, দৃষ্টিকোণ এবং সংস্কৃত-আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের তার-তম্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রকাশ পেতো। সাহিত্য-মূল্যায়নেও তারতম্য ঘটতো।

এই সাম্প্রদায়িক চেতনা, এবং মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াসের পশ্চাদ্বর্তিতা এবং এইসব কারণে তার প্রতি হিন্দু-সমাজের উপেক্ষা বাস্তব ব্যাপার ছিল। এবং অন্যান্য অনেক কারণসহ এই কারণেও অধিকাংশ মুসলিম লেখক পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, যে সব মুসলিম লেখক হিন্দু-সমাজেরও কমবেশী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তাঁরা পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। এঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ ও হুমায়ুন কবির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি সাম্প্রদায়িকতা না থাকতো, এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও না থাকতো এবং মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াস উপেক্ষিত হচ্ছে এই ধারণা যদি গড়ে না উঠতো তাহলে মুসলিম লীগের লাহোর-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর "সাহিত্যে পাকিস্তান" রবটি উঠতো না। উল্লেখনীয় যে বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে চল্লিশের দশকে ঐ শিরোনামে কিছুদিন বিতর্ক চলেছিল। সমস্যাটা ছিল এই যে সমগ্র উপমহাদেশের বহুদিনের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সঙ্গেই সাহিত্যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যচেতনা জড়িত ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম লেখকগণ তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবেন এবং তাঁদের সাধনার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এই ছিল

তাঁদের প্রত্যাশা। আরও প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তানে তাঁরা একদিন হিন্দুদের মতোই উন্নত সাহিত্য গড়ে তুলতে পারবেন। "পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি" এবং অনুরূপ সংস্থা আয়োজিত সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলি ঐসব প্রত্যাশাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর যখন শোনা গেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু তখন ঐ সাহিত্য প্রত্যাশার উপরেই প্রথম আঘাত পড়েছিল। হিন্দুসমাজ এবং হিন্দু লেখকগণ মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াসকে উপেক্ষা করে এসেছেন তবু উভয়ের ভাষা এক এবং সেদিক থেকে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত; কিন্তু পাকিস্তানে অবাঙ্গালীদের সঙ্গে একে তো অনুরূপ ভাষাবন্ধন অনুপস্থিত, তার উপর উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সাহিত্যিক আরও উপেক্ষিত হবেন এটাই অনিবার্য। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত উন্নত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের অশুভ দিক, এবং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত ছিলেন, কেননা তার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই ছিল। পাকিস্তানে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য যে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে, এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে তার একটা ফলাফল দেখা যাবে, আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে যে শুভ হবে না এ বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এবং তাঁরা এই অবিচারে সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন যে পাকিস্তানে বাঙালীই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, এবং বাংলা ভাষা উপেক্ষিত হতে যাচ্ছে, মুসলিম সাহিত্য-প্রয়াসের প্রতি হিন্দু সমাজের উপেক্ষার থেকে যার অশুভ ফলাফল কোনো অংশে কম হবে না।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতি অবিচার হবে এ সম্বন্ধেও বাঙালীর মনে কোন সন্দেহ ছিল না, কেননা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। বৃটিশ আমলে শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু অগ্রসর ছিল, এবং তার ফলে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রাধান্যের ফলে মুসলমানদের চাকুরী পাওয়া ছিল কঠিন। এর দরুন সে হতো বঞ্চিত। পাকিস্তানে এর প্রতিকার হবে বলে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ আশা করেছিল। পাকিস্তান-দাবীর সপক্ষে একটা বড় যুক্তি

ছিল সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও বঞ্চনা। কোন্ অফিসে কিরূপ অবিচার ও বঞ্চনা হয়েছে পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রে তার বিবরণ প্রকাশিত হতো। এইসব বিবরণ পাকিস্তান আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতো। কিন্তু উর্দু রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব অপর এক সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করলো। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বাঙালী মুসলমান বুঝলো পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে সেই একই ব্যাপার ঘটবে। উর্দু জানার ফলে অবাঙালীরা আগে থেকেই এগিয়ে আছে, অতএব সরকারী চাকুরীতে তারাই প্রাধান্য পাবে, এবং বরাবর এই প্রাধান্য চলতে থাকবে। বৃটিশ আমলে বাঙালী মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে, পাকিস্তান আমলে অবাঙালী মুসলমানদের দ্বারা বঞ্চিত হবে।

চাকুরীর প্রশ্ন থেকে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রশ্নও এসে গেছে। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে না, বদ্ধমুখ অবস্থায় স্বাধীনতা পাবে, এবং বাঙালীর স্বতন্ত্র সত্তাই বিপন্ন হয়ে উঠবে,[২৬] উর্দু বিদেশী ভাষা,[২৭] এ ভাষা পূর্ব পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা হলে এদেশ হবে উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, এবং জাতি হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তানীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে উঠবে,[২৮] বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ রাজের হাত হতে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের কবলে গিয়ে পড়বে, এবং জোর করে উর্দু রাষ্ট্রভাষা পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দিলে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে[২৯] এসব উক্তি করেছিলেন বিভিন্ন লেখক, ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭-এর মাস দুই আগে থেকে পরবর্তী চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই।

ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিভাবনার ভিত্তিতে একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসাবে স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিয়তিচেতনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ এবং ঐ স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার ও একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের ইচ্ছা, জাতীয়তাবাদের এইসব লক্ষণ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এই জাতীয়তাবাদ খুব স্পষ্ট ছিল না এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-কামনাও এর অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু ভাষা সাহিত্য ও চাকুরীর প্রশ্নে এই অনুভব বাঙালী শিক্ষিত মুসলিম সমাজে খুব

দ্রুত ব্যাপ্ত হয়েছিল ; এবং এটাই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণ। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল লেখকদের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আলোচনায়, পাকিস্তান সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই, কোলকাতার পত্র-পত্রিকায়, এবং পরেও তাঁরা ক্রমাগত লেখনী চালনা করে গেছেন। এইভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সরব প্রকাশ। পুরনো সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুভব থেকে এর উদ্ভব হলেও, এই অনুভবের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাঙালী মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. বদরুদ্দিন উমর, 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি," ১৯৭০। অধ্যাপক আবুল কাসেম সম্পাদিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সম্পাদিত "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস" (১৯৬৭)-ও দ্রষ্টব্য।

২. "বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব," দৈনিক ইত্তেহাদ (কোলকাতা), ২৯শে জুন, ১৯৪৭।

৩. ঐ

৪. "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" দৈনিক আজাদ (কোলকাতা), ৩০শে জুন, ১৯৪৭।

৫. ঐ

৬. ঐ

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. "উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে," ইত্তেহাদ (কোলকাতা) ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭।

১০. ঐ

১১. সাপ্তাহিক "মিল্লাত" (কোলকাতা) ২৭শে জুন, ১৯৪৭।

১২. "গৈরিক," একুশে সংকলন (১৯৭১)-এ পুনর্মুদ্রিত। সংকলনের সম্পাদক বলেছেন এটি "রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ।" কিন্তু তা যে নয়, তা আশা করা যায় এই আলোচনার প্রথমাংশেই পরিষ্কার হয়েছে।

১৩. "সওগাত" আশ্বিন, ১৩৫৪।

১৪. "কৃষ্টি" কার্তিক ১৩৫৪ নভেম্বর ১৯৪৭। যতদূর জানা যায় এই পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৫. সেকালে অনেক লেখকই পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করেও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষার কথা বলেছেন, এবং এই দুই অঞ্চলকে 'রাষ্ট্র' বলেও বর্ণনা করেছেন।

১৬. এই প্রবন্ধটিই ঢাকা থেকে তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

১৭. "সওগাত" অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪।

১৮. বলা প্রয়োজন, ঐ সময়ে "সওগাত"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, খুলনার বাঁশদহ গ্রাম থেকে। বস্তুতঃ তিনি বহু বছর ধরেই ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখেছেন। সম্পাদকীয়তে ব্যক্ত রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের নিজস্ব কোনো মতামত ছিল বলে মনে হয় না।

১৯. "সওগাত" চৈত্র, ১৩৫৪ (সম্পাদকীয়), ২৩৯ পৃষ্ঠা।

২০. "সওগাত," বৈশাখ, ১৩৫৫ (সম্পাদকীয়) ২৭৮ পৃষ্ঠা।

২১. উল্লিখিত সময়ে 'ইত্তেহাদ', সাপ্তাহিক 'বেগম' এবং অন্যান্য পত্রিকায় একমাত্র উর্দুর বিরুদ্ধে আরও কিছু লেখা বেরিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা ছিল 'ইত্তেহাদ'-এর, যা এখনও গবেষণা-সাপেক্ষ।

২২. এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম সম্পাদিত 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' (১৯৬৭) এবং বিশেষ করে বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত পুস্তিকা পড়ে মনে হয় যেন ভাষা-আন্দোলন ছিল প্রায় সর্বতোভাবে তমদ্দুন মজলিশের আন্দোলন। এ আন্দোলনে উক্ত সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এটা একটা একপেশে অত্যুক্তি।

২৩. বদরুদ্দীন উমর, "পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি," ৩ পৃষ্ঠা। কামরুদ্দিন আহমেদ, "দি সোস্যাল হিস্ট্রী অব ইস্ট পাকিস্তান" ১ম সং, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।

২৪. "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" দৈনিক আজাদ (কোলকাতা), ৩০শে জুন, ১৯৪৭।

২৫. Keith Callard, "Pakistan, A Political Study, ১৮১পৃষ্ঠা।

২৬. "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা," দৈনিক "আজাদ" ৩০শে জুন, ১৯৪৭।

২৭. সাপ্তাহিক "মিল্লাত," ২৭শে জুন, ১৯৪৭। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, "পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা" "কৃষ্টি," নভেম্বর, ১৯৪৭!

২৮. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত।

২৯. কাজী মোতাহার হোসেন, "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা" "সওগাত," অগ্রহায়ণ ১৩৫৪।